ইউনিট
২

শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ
(Entrepreneurial Environment)

ভূমিকা (Introduction)

সাধারণতঃ পরিবেশ বলতে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং এগুলোর অবস্থানকে বোঝানো হয়ে থাকে। যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে একটি পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়। তাই প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে প্রত্যেক শিল্প উদ্যোক্তাকেই পরিবেশ সম্পর্কে ও এদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রভাব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। তা না হলে কোন উদ্যোক্তাই সফলতা অর্জন করতে পারে না। এ পরিবেশকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা যায় যথাঃ অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও বাহ্যিক পরিবেশ। অভ্যন্তরীণ পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন, ব্যবস্থাপনার নীতি, কার্যপদ্ধতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার মনোভাব, কর্যপরিবেশ ইত্যাদি। এগুলো একজন উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রেণের মধ্যে থাকে। পক্ষান্তরে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাহিরে যে পরিবেশ বিরাজমান, তাই মূলত বেশী গুরুত্বপূর্ণ; যা একজন শিল্প উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ বাহ্যিক পরিবেশ আবার দু'ধরণের হয়ে থাকে যথাঃ ১। ব্যাষ্টিক পরিবেশ (Micro envirionment) ২। সামষ্টিক পরিবেশ (Macro environment) ব্যাষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো হলো, যেগুলো সরাসরি একটি শিল্পকেই প্রভাবিত করে। যেমনঃ গ্রাহক, সরবরাহকারী, মধ্যস্থতাকারী, প্রতিযোগী প্রভৃতি। অন্যদিকে সামষ্টিক পরিবেশ বলতে এমন কতগুলো উপাদানকে বোঝায় যা কোন নির্দিষ্ট শিল্পকে প্রভাবিত না করে একটি এলাকা বা সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানকে কমবেশী প্রভাবিত করে। যেমনঃ জনসংখ্যা, রাজনীতি, প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তি প্রভৃতি। এসকল উপাদান নিয়েই শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ গড়ে উঠে। এ পরিবেশের উপাদানগুলো একে অপরের উপর ক্রিয়াশীল। একজন উদ্যোক্তাকে সফলতা লাভ করতে হলে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আগরওয়ালা যথার্থই মন্তব্য করেন যে, পরিবেশ অগ্রাহ্য করার দন্ড অত্যন্ত বেশী। এ ইউনিটে অমরা পরিবেশের সংজ্ঞা, শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ ও তার উপাদানসমূহ, ব্যবসায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব, শিল্পনীতি, শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, যা একজন শিল্পোদ্যোক্তার সফলতার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

পাঠ-১ঃ পরিবেশের সংজ্ঞা, শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশের উপাদান ও গুরুত্ব (Definition, Components and Importance of Entrepreneurial Environment)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- পরিবেশের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশের ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশের উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু:

পরিবেশের সংজ্ঞা (Definition of Environment)

মানুষ তাঁর চারপাশে যে সকল অবস্থার মধ্যে বসবাস করে তাই তাঁর পরিবেশ। এ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে সকল অবস্থা আছে তার মধ্যে গাছপালা, নদনদী, ভূ-প্রকৃতি, পাহাড়-পর্বত, জলবায়ু, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রযুক্তি, আইন-কানুন, সামাজিক রীতি-নীতি, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর সমন্বয়েই একটি নির্দিষ্ট আকারের পরিবেশ গড়ে উঠে। মানুষের জীবনের প্রতিস্তরেই পরিবেশের প্রভাব বিরাজমান। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও পরিবেশের প্রভাব বিদ্যমান। অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধাণে পরিবেশের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটি হলো- "পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহ, অঞ্চল বা অবস্থা"। পরিবেশ প্রসঙ্গে কটলার (Kotler) বলেন যে, "পরিবেশ হলো সমগ্র শক্তি ও সত্ত্বার সমন্বিত রূপ, যা বাহ্যিক এবং সম্ভাবনাময় কোন বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে সম্পর্কযুক্ত"।

অধ্যাপক চেম্বার্স এর মত অনুসারে,"কোন কিছুর উন্নতি বা সমৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের সমষ্টিই হলো পরিবেশ।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে পরিবেশের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়:

১. পরিবেশ হলো কতগুলো শক্তি ও সত্ত্বার সমন্বিত রূপ;
২. পরিবেশের উপাদানগুলো মূলতঃ বাহ্যিক দিক থেকে সৃষ্ট;
৩. এ উপাদানগুলো বিশেষ কোন বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে;
৪. এ উপাদানগুলো পরস্পর ক্রিয়া প্রক্রিয়াশীল;
৫. পরিবেশ মানুষ, জীব, কীট পতঙ্গ, প্রতিষ্ঠান যে কোন কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তাই পরিশেষে বলা যায় যে, কতগুলো বাহ্যিক শক্তি ও সত্ত্বার সমষ্টি যা কোন বিশেষ বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তারের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে পরিবেশ বলে।

শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ (Entrepreneurial Environment)

একজন শিল্পোদ্যোক্তা যে পরিবেশের মধ্যে কাজ করে তাকেই শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ বলা যায়। কটলার (Kotler) শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের উপর সকল প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিকে বুঝিয়েছেন। একটি উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমগুলোকে ম্যাকারথি (Macarthy) চারটি 'p' দ্বারা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। যথাঃ Product (উৎপাদিত পণ্য), Price (দ্রব্যের মূল্য) Place (স্থান) এবং Promotion (প্রসার)। তাই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত উপাদানগুলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধান ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সম্পাদন করতে হয়। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সফলতা সুষ্ঠু সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। পরিবেশকে সাধারণতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১। অভ্যন্তরীণ উপাদান ও ২। বাহ্যিক বা বহিঃউপাদান। অভ্যন্তরীণ উপাদান যেমন: কর্মীদের দক্ষতা ও নৈপূণ্য, কার্য পরিবেশ, কার্যকর কর্ম-পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও শীর্ষ স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের ইতিবাচক ও গতিশীল নেতৃত্ব প্রভৃতি; যার উপর একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। অপর দিকের বহিঃউপাদানগুলোর মধ্যে অনুকুল ব্যবসায়িক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রযুক্তিগত পরিবেশ, প্রতিযোগীতা, সরকারী মনোভাব ও সহায়তা ব্যবসায়ের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এগুলো ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এ উপাদানগুলো পরস্পর নির্ভরশীল।

কার্যত: একজন উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ ও বহি:উপাদানগুলো যথাযথ মূল্যায়ন করে তার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন, ও ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীগুলো পরিচলনা করতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উভয় পরিবেশের প্রভাববিস্তারকারী উপাদানগুলো যথাযথ ভাবে যদি মূল্যায়ন করা না হয় তাহলে ব্যবস্থাপনার কোন কার্যক্রমই কার্যকর না হয়ে ক্রটিপূর্ণ হবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আগরওয়ালা হুসিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যে, পরিবেশকে অগ্রাহ্য করলে তার দন্ড অনেক বেশী দিতে হবে। এটি শুধু মুনাফার পরিমাণই হ্রাস করে না এবং ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের সুযোগই শুধু হাতছাড়া হয় না, বরং সামাজিক বৈরিতারও জন্ম দেয় এবং ক্রমান্বয়ে সমাজিক পরিবেশকে ব্যবসায়ের স্বার্থের প্রতিকূলে দাঁড় করায়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, একজন সফল উদ্যেক্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। একজন উদ্যোক্তা ও প্রশাসককে নিম্নলিখিত কারণে ব্যবসায়ের পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন:

১. যেহেতু ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ ও বহি:পরিবেশের উপাদানগুলো একটি ব্যবসায়ের কার্য প্রয়োগ ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে, তাই ব্যবসাকে সফলজনকভাবে পরিচালনা ও কার্য সম্পাদনের জন্য এগুলো সম্পর্কে তথ্য জানা আবশ্যক।

২. পরিবেশের উপাদানগুলো পরিবর্তনশীল। তাই একজন উদ্যোক্তাকে পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে শতর্ক ও সজাগ করে তুলে। যার কারণে, একজন উদ্যোক্তা পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে ব্যবসায়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় এনে ব্যবসায়ের গতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

৩. বহি:পরিবেশ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বহি:পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও তথ্য থাকলে ব্যবসায়ের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা জন্মায়; যা একটি নতুন ও পুরান প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে, নতুন ও পুরাতন উভয়ধরণের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে।

৪. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই কোন না কোন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কাজ করে। বিশেষ করে, গনতান্ত্রিক পরিবেশে সকল প্রতিষ্ঠানকে জনসমর্থন নিয়ে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে হয়। এ জন্য পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশকে অনুকূলে আনার জন্য সদা স্বচেষ্ট থাকা বাঞ্চনীয়। তাই একজন উদ্যোক্তাকে পরিবেশের প্রকৃতি, গুরুত্ব, ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের সাথে পরিবেশকে সহানুভূতিসম্পন্ন, উপযোগী ও সুবিধাজনক করে গড়ে তুলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৫. চলমান কোন পরিবেশকে কারো পক্ষেই একেবারে উপেক্ষা করা অসম্ভব। যেক্ষেত্রে পরিবেশের উপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদানগুলোকে অনুকূল বা কাম্য পর্যায়ে আনা সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে, চলমান পরিবেশকে বিচার বিশ্লেষণ করে তার সাথে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন করে চলাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রমানিত হলো যে, পরিবেশের প্রকৃতি ও প্রভাব যে প্রকার ও যে ধরনেরই হউক না কেন, তা একজন উদ্যোক্তার পক্ষে উপেক্ষা বা কম গুরুত্ব দেবার কোন সুযোগ নেই। অতএব, একজন উদ্যোক্তাকে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘস্থায়ী সফলতা অর্জনের জন্য অবশ্যই পরিবেশের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া স্বীকার করে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম চালাতে পরিবেশকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

শিল্পোদ্যোগের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদন সমূহ
(Influencing Factors on Entrepreneurial Environment)

শিল্পোদ্যোগের উপর নানাভাবে বিভিন্ন উপাদানসমূহ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিভিন্ন লেখক ও গবেষকগণ শিল্প-উদ্যোগের উপর পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে অসংখ্য পরিবেশের উপাদান চিহ্নিত করেছেন। যেমন, নাউমস্ (Naums) এর মতে, যে সকল উপাদান শিল্প-উদ্যোগকে প্রভাবিত করে তনমধ্যে অর্থ সংস্থানের বহি:সমর্থন; প্রযুক্তি বিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, ও উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভেসপার ও আলবাউম (Vesper and Albaum) বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। যথা: অভ্যন্তরীণ বাজার, কৃত্রিম উৎপাদান, শিল্প, কারীগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রম শক্তি, গবেষণা ও পরীক্ষাগার, সরকারী ও বেসরকারী গবেষণাগার, মূলধনের উৎস এবং সরকারী সহযোগীতা একজন

নতুন শিল্প-উদ্যোক্তাকে প্রভাবিত করে। এধরণের অনেক গবেষক ও লেখক এধরণের বহু উপাদানসমূহ চিহ্নিত করেছেন। আমরা নিচে শিল্প-উদ্যোগ পরিবেশকে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদানগুলো বর্ণনা করব।

১. **প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment):** প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদনদী, বনজ ও খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক দূর্ঘটনা যেমন- ঝড় বাদল, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠে। ফলে দেশ বা অঞ্চল ভেদে মানুষের জীবিকার পথও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন: নাতীশীতোষ্ণ জলবায়ু ও সমতল প্রকৃতির ভূমিতে মানুষের বসবাস বেশী বলে এ সকল অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প যথেষ্ট অগ্রসর। আবার, বিভিন্ন সম্পদের উৎপাদন ও সরবরাহের কারণে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠে। যেমন বাংলাদেশে পাটের কারণে পাট শিল্প গড়ে উঠেছে। তাই বলাযায়, প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক পরিবেশ শিল্প-উদ্যোগের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

২. **অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Enviornment):** অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে একটি অঞ্চল বা দেশের মানুষের আয়, সঞ্চয়, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাসংকোচন, উন্নত পুঁজিবাজার, শেয়ার বাজার, পণ্য বাজার, প্রভৃতিকে বুঝিয়ে থাকে। এগুলো একজন উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে আবার অনেক ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করে থাকে। যদি জনগণের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকে, তবে ভোগ ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রুচির পরিবর্তন হয় বলে নতুন ও উন্নতমানের পণ্য ক্রয়ে আগ্রহ জন্মায়; যার ফলে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণ আগ্রহ প্রকাশ করে। অনুকূল অর্থনীতির ফলে বিভিন্ন উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ বিনিয়োগে উৎসাহবোধ করে। ফলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। পক্ষান্তরে, মানুষ আর্থিক অসচ্ছলতায় পড়লে ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে ধীরে ধীরে ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে নতুন কোন উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ পায় না। শুধু দেশের নয়, আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাবও শিল্প-উদ্যোগের উপর পড়ে। তাই বলা যায় যে, শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিবেশ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Social and Cultural Environment):** প্রতিটি দেশের বা অঞ্চলেরই তাদের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিরাজ করে। একটি দেশের জনসাধারণের আচারআচরণ, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সহনশীলতা ও যে সকল কর্মকান্ড প্রচলিত আছে তাদের সমষ্টিই হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। একজন উদ্যোক্তার উদ্যোগ গ্রহণ বহুলাংশেই এসকল উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন: পশ্চিমা দেশসমূহে মদ্যপান সমাজের সাংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে; ফলে, সেখানে মদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তার অভাব নেই। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশ তথা মুসলিম দেশগুলোতে জন্য এটা সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী বিধায় এধরণের ব্যবসায়ের প্রসার ও প্রচার একেবারেই সীমিত। তাই বলা যায়, ব্যবসা বাণিজ্যে সমাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি হয় বাঁধার সৃষ্টি করছে অথবা উৎসাহিত করছে। এ ভাবেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ শিল্প-উদ্যোগের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে গণ্য হচ্ছে।

৪. **রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment):** দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের উপর শিল্প-উদ্যোগের ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যদি স্থিতিশীল ও অনুকূল হয়, তবে উদ্যোক্তাগণ নতুন নতুন শিল্পে উৎসাহিত হন। যদি রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল হয় এবং শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করে, তবে উদ্যোক্তাগণ শিল্প বিমুখ হয়ে পড়েন। কারণ, তখন দেশে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয় ও আইনের শাসন ভেঙ্গে পড়ে। ফলে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয় না। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বারা শিল্প-উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

৫. **আইনগত পরিবেশ (Legal Environment):** একটি সমাজে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বসবাস করতে হলে কতগুলো রীতিনীতি, প্রথা, নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এ সকল রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনকে আইনগত পরিবেশ বলে। যেকোন দেশের জন্য আইনগত পরিবেশ শিল্প-উদ্যোগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যবসা বাণিজ্যে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে সারা পৃথিবীতেই শিল্প ও শ্রমিক আইন প্রণীত হয়েছে। আবার, কিছু কিছু দেশে পৃথক বাণিজ্যিক আদালতও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে যদি শুধু আইন কানুন ও তার যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা কার্যকর থাকে, তবে শিল্পে নতুন নতুন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। দেশের সরকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার্থে সুষ্ঠুভাবে আইন প্রয়োগ করলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। সুতারাং, বলাযায় যে, শিল্প-উদ্যোগের জন্য আইনগত পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

৬. **প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technological Environment):** প্রযুক্তি আধুনিক বিজ্ঞানের ফসল। আর যে দেশ প্রযুক্তিতে যত উন্নত; সে দেশ শিল্প কারখানাতেও তত বেশী উন্নত। প্রযুক্তি একটি দেশের জন্য বিপ্লব বয়ে আনতে পারে। নতুন নতুন প্রযুক্তি মানুষকে আরো নতুন শিল্প-উদ্যোগকে তরান্বিত করছে। নতুন ও উন্নত প্রযুক্তির ফলে কম সময়ে বেশী লাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এতে ভোক্তারা কম দামে দ্রব্য পাবার ফলে তাদের ভোগ প্রবণতা বেড়েছে, ফলে চাহিদাও বেড়েছে। এ জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নতুন নতুন উদ্যোগের। তাই বলা যায়, প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে শিল্প-উদ্যোগের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। তাই দিন দিন উদ্যোক্তাদের প্রসারও ঘটছে প্রচুর পরিমাণে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, দেশের শিল্প-উদ্যোগের উপর প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও আইনগত পরিবেশগুলো অনুকূলে আনবার জন্য সরকার আইনগত, সাংস্কৃতিকে রাজনৈতিক ও শিল্পনীতিসহ বিভিন্ন সংস্কার কার্য হাতে নিয়ে থাকে; যাতে করে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদেরকে বেশী বেশী সুযোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা যায়।

শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশের গুরুত্ব
(Importance of Entrepreneurial Environment)

আমরা একটু আগেই দেখতে পেলাম যে, শিল্পোদ্যোগের উপর বিভিন্ন পরিবেশগত উপাদান ক্রিয়াশীল। পরিবেশ অনুকূল ও সহায়ক হলে শিল্প কারখানা প্রসার লাভ করে, আর তা না হলে শিল্প কারখানার উন্নয়ন ব্যাপকভাবে ব্যহত হয়। ফলে অর্থনীতির চাকা ধমকে যায়। এসকল উপাদানের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে প্রতিষ্ঠানের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজতর হয়। তাই বলা যায়, শিল্পোদ্যোগে পরিবেশ যথেষ্ঠ গুরুত্ব বহন করে। শিল্পোদ্যোগ পরিবেশের গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. **অর্থনৈতিক সংগঠন (Economic Organization):** প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এক একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা, জলবায়ু, গড় আয়, আইনকানুন, সংস্কৃতি প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক উপাদান দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়। তাই যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য এ সকল বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

২. **পরিবেশকে বিবেচনা করা (Considering the Environment):** যেহেতু প্রতিষ্ঠান পরিবেশ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এসকল উপাদানের উপর তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না বিধায় পরিবেশের প্রতিকূলে সিদ্ধান্ত নিলে তা কার্যকর হয় না। তাই পরিবেশের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী বাস্তব ভিত্তিক যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

৩. **বিনিয়োগের নিরাপত্তা (Security of Investment):** বিনিয়োগের শুরুতেই বিনিয়োগের নিরাপত্তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। বিনিয়োগ থেকে আয়, তারল্য প্রভৃতির বিষয়েও আগাম ধারণালাভ করা প্রয়োজন। আর এগুলো শিল্প-উদ্যোগ পরিবেশ দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে থাকে বিধায় এসকল বিষয়ে পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে হবে। তা না হলে বিনিয়োগ থেকে আশানুরূপ ফল লাভ করা যাবে না।

৪. **অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউপাদান (Internal and External Element):** ব্যবসা বাণিজ্যের উপর দেশের ভেতর ও বাহিরের যেসকল উপাদান প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ উপাদানের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সরকারের আমদানী-রপ্তানী নীতি, সরকারের বিধিনিষেধ উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক উপাদান যেমন; অর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও ব্যবসাকে প্রভাবিত করে। তাই এগুলো সম্পর্কেও পূর্বানুমান ও পরিবর্তন সম্পর্কে সতর্কতামূলক কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

৫. **প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা (Idea About Internal Environment of the Organization):** একজন শিল্প উদ্যোক্তাকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শক্তিশালী ও দূর্বল দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, যাতেকরে বহিঃপরিবেশের সাথে নিজ প্রতিষ্ঠানকে খাপখাওয়ানো। প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সংস্কার সাধন করে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে হবে। কারণ অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অনেকাংশেই কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে।

৬. **বিদ্যমান পরিবেশ বিশ্লেষণ (Analysis of Existing Environment):** পরিবেশ পরিবর্তনশীল। তাই বিশেষ করে বহি:পরিবেশ কোম্পানীর বিপক্ষে যেতে পারে; সে ক্ষেত্রে পরিবেশকে বিশ্লেষণ করে সে অনুসারে সমন্বয় সাধন করত: প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে পূনর্গঠন করতে হবে।

বি,সি, টেনডন (B.C. Tandon) শিল্প-উদ্যোগের পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করছেন। যথা: ১। পরিবেশই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিষ্ঠানও এটা মনে করে যে, পরিবেশ প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। ২। উদ্যোক্তা এবং ব্যবস্থাপক পরিবেশের সঙ্গে নিজ উদ্দেশ্যের আলোকে তালমিলিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ৩। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, যাতে পরিবেশকে অনুকূল ও সুবিধাজনক করে তুলে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়। তাই বলা যায়, কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই পরিবেশের প্রভাবকে উপেক্ষা করে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় যেকোন প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হলে এবং দীর্ঘ মেয়াদী সময়ে ব্যবসায় সফলভাবে পরিচালনার জন্য শিল্পোদ্যোগার শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশের নানান দিক বিবেচনা করতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

পরিবেশ হলো কতগুলো বাহ্যিক শক্তি ও সত্তার সমষ্টি যা কোন বিশেষ বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তারের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে পরিবেশ বলে।একজন শিল্প উদ্যোক্তা যে পরিবেশের মধ্যে কাজ করে, তাকেই শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ বলা যায়। শিল্প-উদ্যোগ পরিবেশকে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদানগুলো হলো-প্রাকৃতিক পরিবেশ ,অর্থনৈতিক পরিবেশ ,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ ,আইনগত পরিবেশ ,প্রযুক্তিগত পরিবেশ। শিল্প-উদ্যোগ পরিবেশের গুরুত্ব হলো: বিদ্যমান পরিবেশ বিশ্লেষণ, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা, অভ্যন্তরীণ ও বহি:উপাদান ,বিনিয়োগের নিরাপত্তা প্রভৃতিক্ষেত্রে পরিবেশকে বিবেচনা করা, অর্থনৈতিক সংগঠনের জন্য একান্ত আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিবেশ বলতে কি বোঝেন?
২. শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশের সংজ্ঞা দিন।
৩. পরিবেশের উপাদনগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবসায় পরিবেশ বলতে কি বোঝেন? ব্যবসায় পরিবেশের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. শিল্পোদ্যোগে পরিবেশের উপাদনগুলো বর্ণনা করুন।
৩. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনীতি ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

পাঠ-২ ঃ ব্যবসায়িক পরিবেশ (Business Environment)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়িক পরিবেশ বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- ব্যবসায়িক পরিবেশের রাজনৈতিক দিকগুলো বলতে পারবেন;
- ব্যবসায়িক পরিবেশের অর্থনৈতিক দিকগুলো বলতে পারবেন;
- ব্যবসায়িক পরিবেশের আইনগত দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যবসায়িক পরিবেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো বলতে পারবেন;
- ব্যবসায়িক পরিবেশের কারিগরি দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যবসায়িক পরিবেশ (Business Environment)

আমরা প্রথম পাঠে সাধারণ পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ পাঠে ব্যবসায়ের পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে। ব্যবসায় পরিবেশ বলতে বুঝায় মূলত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে সকল পরিবেশের মধ্যে কাজ করে। অর্থাৎ একটি ব্যবসাকে যে সকল উপাদান প্রভাবিত করে, সেগুলোর সমষ্টিই ব্যবসায় পরিবেশ। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদানগুলোর মধ্যে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আইনগত, সরকারী নীতি, প্রতিযোগী, সরবরাহকারী ইত্যাদি অন্যতম। ব্যবসায়ের পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ ব্যাষ্টিক পরিবেশ ও সামষ্টিক পরিবেশ। ব্যষ্টিক পরিবেশের মধ্যে কোম্পানী, সরবরাহকারী, মধ্যস্থকারী, ক্রেতাসাধারণ, প্রতিযোগী, ও জন সাধারণ অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো হচ্ছেঃ জনসংখ্যা পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রযুক্তিগত পরিবেশ ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ। এ পরিবেশগুলোর অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার কারণেই ব্যবসায়ের সফলতা-ব্যর্থতা আনেকাংশে নির্ভর করে।

ব্যবসায়িক পরিবেশের রাজনৈতিক দিক (Political Aspects of Business Environment)

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং রাজনীতির সাথে ক্রিয়াশীল সম্পর্ক বিরাজমান। যেমনঃ দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ সরকারী নীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলের সাথে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। বিশেষ করে, সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দলের সাথে ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সমঝতার মাধ্যমে সরকার ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এসম্পর্কের ফলে ব্যবসায়ীগণ স্থিতিশীল সরকার প্রত্যাশা করে, যার মাধ্যমে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। আবার সরকার ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতিমালা আলোচনা করে বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে সক্ষম হয়। নিম্নে সরকার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াশীল কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. **করকাঠামোর পুর্নবিন্যাসের মাধ্যমে নতুন কর প্রস্তাবঃ** সরকার বিশেষ করে বাজেট ঘোষণার প্রক্কালে নতুন কর প্রস্তাব, পূর্বকার কর কাঠামোর পূর্ণবিন্যাস এবং কখনও কখনও প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক নীতিগ্রহণের প্রস্তাব করে থাকে। এধরণের পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদয়ের বিভিন্ন সংগঠন সোচ্চার হয়ে উঠে ও প্রতিবাদমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সরকারের প্রস্তাবিত কর ও করকাঠামোর পরিবর্তনে প্রতিকূল প্রভাবের পক্ষে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। পাশাপাশি বিরধীদল ও ব্যবসায়ীদের সাথে তাল মিলিয়ে বক্তব্য পেশ করতে থাকে। তবে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিবাদী গোষ্ঠী দূর্বল হলে সরকার তা উপেক্ষা করে চলে; কিন্তু ব্যবসায়ী মহল শক্তিশালী হলে সরকার কিছু ছাড় দিয়ে ব্যবসায়ীদের দাবীকে সমন্বয় করে করকাঠামো পূর্নগঠন করে থকে। এমনকি করকাঠামোর কোন ধরণের পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনার ভিত্তিতেই তা করে থাকে।

২. **করহার ও লাইসেন্স নীতিঃ** ব্যবসাযের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক গবেষক প্রমাণ পেয়েছেন যে, সরকারের নীতি প্রণয়নে বিশেষ করে কর হার, লাইসেন্স নীতি এবং অন্যান্য নীতিসমূহ ব্যবসায়িক

উদ্যোগ ও কার্যক্রমের উপর অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব ফেলে থাকে। যেমন, হলিংম্যান ও হ্যান্ড একটি গবেষণায় দেখতেপান যে, কর ও লাইসেন্স সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় বিধানসমূহ নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল কিংবা অন্য অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের নিকট অধিক লোভনীয় হতে পারে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে অনুন্নত এলাকাকে উদ্যোক্তাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় করার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করে থাকে। যদিও কর সুবিধা এককভাবে শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করতে পারে না। তাহলেও সরকারের রাজস্বনীতি শিল্পোদ্যোগকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। তাই দেখা যায় যে, সরকারী নীতিমালা, বিভিন্ন সংস্থার কর্মকান্ড ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। আরও লক্ষ্যণীয় যে, দেশের উৎপাদিত পণ্য আর্ন্তজাতিক বাজার লাভ করার ক্ষেত্রে সরকারের সমর্থন ও প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

৩. **সরকারী শিল্প খাতের প্রভাব:** বর্তমান সময়ে সবদেশেই কম বেশী সরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়; যদিও বিভিন্নদেশে এর ব্যপ্তি ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনগণের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠে। তাই সরকার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সরকার করের উদ্দেশ্যে ও সরকারি নীতির সাথে মিল রেখেই এসকল প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর জনগণের নিকট জবাবদিহিতার জন্য সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয় বলে 'সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ' সরকারী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়।

৪. **বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি:** মিশ্র অর্থনীতি বিশেষ করে যেখানে প্রচুর সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে সরকারী ও বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারের কাছ থেকে বেশী সুযোগ সুবিধা লাভ করে । সরকার ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে কমই বিশ্বাস করে, অনুরূপভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বাস করে না। এ ধরণের পরিবেশ শিল্প বিকাশের অন্তরায় হয়ে থাকে। তাই, এক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তোলা ও বজায়রাখা প্রয়োজন, যাতে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা থাকে। এতে সুষ্ঠু শিল্প পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

উপরে আমরা সরকার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছি; এখন সরকার ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে এবং ব্যবস্থাপক ও সরকারী অফিসারদের সথে পারস্পরি সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো ঃ

৫. **রাজনৈতিক দলসমূহকে চাঁদা প্রদান প্রসঙ্গে:** এটা স্পষ্টত:ই পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যবসায়ীগণ রাজনৈতিক দলসমূহকে চাঁদা প্রদান করে থাকেন। এ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দুটি মত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করে, এধরণের চাঁদা প্রদান কোন অপত্তিকর বিষয় নয়; কারণ, তাদের স্বাধীনতা আছে এবং তাদের চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কর্মকান্ড ও নীতিমালাকে তাদের অনুকূলে আনার চেষ্টা অনৈতিক নয়। অবার, অন্য পক্ষ এ যুক্তির বিরোধিতা করে এবং মনে করে যে এভাবে রাজনৈতিক দলকে চঁদা প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; ফলে দেশের জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রকৃত পক্ষে, এ চাঁদাই রাজনৈতিক দলের তহবিলের প্রধান উৎস। যার ফলে সরকারকে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়।

৬. **ব্যবসায়ের প্রশাসক, রাজনৈতিক দল ও সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক:** এটি একটি মত যে, ব্যবসায়ের প্রশাসকগণ অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু, বর্তমান চিন্তা ধারা হলো ব্যবসায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে সরকারী কর্মকর্তাগণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে সরকারের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করত: প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা। তাই সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে এরুপ পরিবেশ বিরাজ করে।

৭. **আর্ন্তজাতিক বাজার:** কোন দেশের পণ্য অন্যদেশে প্রবেশ করার ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা আবশ্যক, নতুবা আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে যায়। কুটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে অন্যদেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠায় নতুন বাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক বাণিজ্যমেলার আয়োজন করা, দেশের উদ্যোক্তাদের বিদেশের বাজারে পরিচয় করিয়ে দেয়া, প্রভৃতি কাজে সরকার কুটনৈতিকভাবে সহায়তা করে। তাই সরকার যদি আন্তরিক হয়, তবে বিদেশে বাজার সৃষ্টির সহায়ক ভূমিকাপালন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সরকারের সাথে ব্যবসায়ীদের সম্পর্কের উপর ব্যবসায়িক অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশ নির্ভর করে। ব্যবসায়িক সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব থাকা আবশ্যক।

ব্যবসায়িক পরিবেশের অর্থনৈতিক দিক (Economic Aspects of Business Environment)

ব্যবসায় সংগঠনগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ওতপ্রতভাবে জড়িত বিধায় ব্যবসায়িক পরিবেশ অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, কর কাঠামো, শিল্পনীতি, কূটনীতি, যোগাযোগ প্রভৃতি সরকারী নীতি দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। তাই কোন দেশের ব্যবসায়ের সফলতা সে দেশের অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। কোন উদ্যোক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সরকারী নীতি ও পলিসি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকার প্রয়োজন আছে। নিম্নে অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহ ব্যবসায়িক পরিবেশকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করা হলো:

১. **মূলধন গঠন:** ব্যবসায়ের মূলধন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ মূলধন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করতে হয় বহি:উৎসহ থেকে। যেমন, ব্যাংক, শেয়ার বাজার, উদ্যোক্তা বা বিদেশী সাহায্য। এ মূলধন প্রাপ্তি যত সহজ হবে, তত বেশী নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠবে। পক্ষান্তরে, কোন অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন পাবার সুযোগ কম থাকলে উদ্যোক্তাগণ অন্যদিকে সরে যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হফম্যান বলেন যে,যদি স্থানীয় ব্যাংক বা অন্যান্য উৎস অনভিজ্ঞতার কারণে এ অর্থসংস্থান কার্য-সম্পাদনে ব্যর্থ হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোক্তাগণকে অন্য স্থানে সরে যেতে হয়। এ অনভিজ্ঞতা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঋণনীতি ও তার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।

২. **যোগাযোগের সুবিধা:** কোন দেশে সুলভ মূল্যে সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সে দেশের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য গড়তে ও তা তার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। যেমন: বাংলাদেশে যমুনা সেতু চালু হবার পর উত্তর বঙ্গের সাথে রাজধানী ঢাকার সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। স্কারী (Schary) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, শিল্পের প্রকৃতি, প্রতিযোগীতা, সাধারণ ও বিশেষ অবস্থান, প্রতিষ্ঠানের আকার, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার, শক্তির প্রাপ্যতা, সংশ্লিষ্টি আইন ও বিধি বিধান ইত্যাদি উত্তরপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি, অগ্রগতিতে অকুকূল যোগাযোগ ব্যবস্থাও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে ব্যবসায়ের প্রকৃতিগত পার্থক্যর কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুপার (Cooper) মনে করেন যে, উন্নত কারিগরি বৈশিষ্ট্যযুক্ত উৎপাদানের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

৩. **ভূমি ও অন্যান্য সুযোগের প্রাপ্যতা:** একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার জন্য অনেকরকম সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হয়; যথা: জমি, শক্তি, শ্রমিক ইত্যাদি। এ সকল সুযোগ-সুবিধার সহজলভ্যতা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন, আমাদের দেশে প্রচুর সস্তা শ্রমিকের প্রাপ্যতার কারণে তৈরী পোশাক শিল্প, কঁচামালের সহজপ্রাপ্যতার জন্য পাট শিল্প গড়ে উঠেছে।

   মহার ও কডিংটন (Mohar and Coddeington) স্বল্প মূল্যে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা উদ্যোক্তাদের জন্য আকর্ষণীয় উপাদান ও শিল্প বিকাশের সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেন। আবার, উন্নত শিল্পাঞ্চলে শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কারণ হিসেবে উন্নত শিল্পাঞ্চলে পানি, শক্তি, পয়:প্রণালী, উন্নত রাস্তাঘাট প্রভৃতি মাধ্যম পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকে বলে উদ্যেক্তাদের নতুন করে এসব বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না।

৪. **সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগের সুবিধা:** যে কোন ব্যবসায়ের কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন, কাঁচামাল, মেশিন পত্র, সরঞ্জামাদী ইত্যাদি সরবরাহকারীদের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদেরকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী করে তুলে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিশেজ্ঞ যেমন: কুপার (Cooper) স্যাপেরো (Shapero), স্কুল হেমার (School Hamer) এবং করিলফ (Khriloff) সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে উল্লেখ করেন। তবে, সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ন্যয় শিল্পের প্রকৃতির উপর যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব নির্ভর করে।

উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, শিল্পের কাঁচামালের ওজন ও পরিমাণ যত বেশী হবে, সেক্ষেত্রে সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা তত বেশী গুরুত্ব পাবে।

৫. **কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল:** যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কম বেশী দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হয়। তবে যে প্রতিষ্ঠান যত বেশী জটিল ও প্রযুক্তি নির্ভর সে প্রতিষ্ঠানে তত বেশী কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল প্রয়োজন হয়। তাই, দক্ষ জনবলের অভাব থাকলে অন্যান্য আনেক সুযোগসুবিধা থাকা সত্তেও সে স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। স্ট্যামফোর্ড গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের একটি গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করেন যে, বৈদ্যুতিক শিল্প কারখানার স্থানীয়করণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষজনশক্তি একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তার ফলে, নতুন কোন স্থানে দক্ষ জনশক্তির অভাবহেতু কোন নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী না হয়ে পুরান স্থান, যেখানে প্রয়োজনীয় দক্ষজনবল আছে সেখানেই শিল্প গড়তে আগ্রহী হয়। যার ফলে, নতুন স্থানে শিল্প স্থাপন না করে, যে স্থানে একইধরণের শিল্প আছে, সেখানেই শিল্প স্থাপন করা হয়ে থাকে।

৬. **রাজস্ব আইন:** সুবিধাজনক ও সুষ্ঠু কর নীতি ও আইন নতুন শিল্প বিকাশে ও চলমান শিল্পকে সম্প্রসারণে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। অপর দিকে, প্রতিকূল রাজস্ব নীতি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পুরান শিল্পের বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। হবিবুল্লাহ ও আহমেদ (Habibullah and Ahmed) তাদের গবেষণায় দেখেন যে, ত্রুটিপূর্ণ রাজস্বনীতির ফলে বাংলাদেশের শিল্প ক্ষেত্রে কাঁচামালের আমদানীর উপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য করা, ত্রুটিপূর্ণ রাজস্বনীতি ইত্যাদি স্থানীয় পণ্যের বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে ব্যয় ও মূল্য বৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে দেশের শিল্প বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

৭. **অর্থনৈতিক গতিশীলতার ধারা:** অর্থনীতির গতিশীলতা বলতে, জনগণের মাথাপিছু উৎপাদন আয়, জাতীয় আয়, ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হারকে বুঝান হয়ে থাকে। দেশের প্রবৃদ্ধির হার ইতিবাচক হলে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়; আর বিনিয়োগ বৃদ্ধিপেলে শিল্প বিকাশের সহায়ক পরিবেশ বেশী সৃষ্টি হয়। আবার এর বিপরীত হলে শিল্প বিকাশে প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সুষ্ঠু শিল্প বিকাশকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে।

ব্যবসায়িক পরিবেশের আইনগত দিক (Legal Aspects of Business Environment)

যে কোন দেশের সরকার ব্যবসা বাণিজ্য বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ আইন প্রনয়ন করে থাকে; যা ব্যবসা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। তাই একজন উদ্যোক্তার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় সংক্রান্ত নানাবিধ আইন কানুন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক; তা না হলে ব্যবসায়ের সফলতা অর্জন করা সম্ভব নাও হতে পারে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে সকল আইন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে তা নিম্নরূপ:

(ক) বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা যেমন: অংশীদারী ব্যবসায়, যৌথ মূলধনী ব্যবসায়, সমবায় সমিতি ইত্যাদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন।
(খ) শ্রম আইন যেমন: কারখানা আইন, মজুরী পরিশোধ আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন ইত্যাদি।
(গ) কর ও রাজস্ব আইন।
(ঘ) বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন।
(ঙ) আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আইন।
(চ) আমদানী রপ্তানী শুল্ক ও অফগারী আইন।
(ছ) প্রইভেটাইজেশন আইন।
(জ) অর্থ ঋণ আদালত আইন ইত্যাদি।

উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকদের শুধুমাত্র বিভিন্ন আইনের বিধান ও কাঠামো অর্থাৎ পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারনাই যথেষ্ট নয়, বরং ব্যবসা ক্ষেত্রে এ সকল আইনের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া কি তাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাদেরকে অবশ্যই দেশের প্রচলিত আইনের পাশাপাশি আইনের প্রয়োগ সম্পর্কেও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আগরাওয়াল (Agrawal) বলেন যে, ব্যবস্থাপককে জানতে হবে, ক) নিজ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, খ) ঐ সকল আইনের বিষয়বস্তু, যা ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে, গ) কারখানা, কর ও কোম্পানী ইত্যাদি সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ, উদ্দেশ্য ও

প্রতিক্রিয়া। তিনি আরো বলেন যে, এগুলো সম্পর্কে প্রথমেই জানতে হবে এবং কার্যক্রম চালিয়ে যাবার পথে তাঁকে আরো অতিরিক্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

একজন প্রশাসককে অবশ্যই আইন মেনে চলতে হবে। তাদের জানতে হবে কোনটি সঠিক আইন এবং কোনটি ব্যবসায়ের স্বার্থে প্রয়োগযোগ্য। ফলে প্রয়োজনে ব্যবসায়িক পরিবেশে বাঁধার সৃষ্টি করে তা পরিবর্তনের জন্য সরকার পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে অর্থাৎ প্রভাবিত করে আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নিজের ও দেশের স্বার্থে কার্যকর করা। তবে যদি এ ধরণের পরিবর্তন সম্ভব না হয়; তবে, প্রচলিত আইনের মধ্যেই তাদের কাজ করতে হবে। সেজন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডকে আইনের সাথে সমন্বয় করতে হবে। ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তাগণ সর্বদা আইন মান্যকারী হবেন। সে জন্য সরকারের উচিৎ শুধু ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুকূল আইন পাশ করে উদ্যেক্তাদের নতুন নতুন শিল্প গড়া ও বর্তমান শিল্পকে সম্প্রসারণ করার জন্য উৎসাহিত করা।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে আইন পরিবর্তিত হয়। আদালতও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। তাই একজন ব্যবসায়ী তথা উদ্যোক্তাকে ও ব্যবসায়িক প্রশাসককে এ ধরণের পরিবর্তনের সাথে পরিচিত থাকা এবং প্রয়োজনে আইনজ্ঞদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এ প্রসঙ্গে কে কে মেহার (K.K.Mehar) বলেন, একজন সফল ব্যবসায়ীকে আইন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ব্যতিত নিম্নক্ত বিষয়গুলোও মেনে চলতে হবে:

১. ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় প্রশাসকগণ এ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন ও প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ নেবেন।

২. প্রসাসনিক আইন সংক্রান্ত প্রচলিত বইগুলো পাঠ করে পরিস্তিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।

৩. নিজ শ্রম সংক্রান্ত আইনজীবির সাথে পরামর্শ করা ও প্রতিবছরের জন্য নিয়োজিত আইনজ্ঞ নিয়োগ করা।

এমন বহু অভিযোগ পাওয়া যায় যে, ব্যবসায়ীগণ আইন অমান্য করে অধিক মুনাফা লাভের আশায় অসাধু ব্যবসায়িক কর্মকান্ড চালিয়ে যায়। এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সহায়তা দান করে থাকেন। তবে, সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশের জন্য এ ধরণের ব্যক্তিদের রুখে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

সাধারণত: এক মালিকানা ব্যবসায়ের জন্য ট্রেডলাইসেন্স, পৌরকর, আয়কর, ও ভ্যাট পরিশোধ প্রভৃতি ব্যতিত তেমন আইন নেই।

অংশীদারী ব্যবসায়ের ১৯৩২ সালের ভারতীয় আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যৌথমূলধনী ব্যবসায় ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন দ্বারা পরিচালিত হতো। তবে, ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন, ১৮৮২ সালের বিনিময়বিল আইনসহ বহু বাণিজ্যিক আইন বৃটিশ কর্তৃক প্রচলিত আইন দ্বারা ব্যবসায়িক আইনগত পরিবেশ প্রভাবিত হয়ে আসছে। এ ছাড়া কলকারখানা আইন, মজুরী পরিশোধ আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশ, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী) আদেশ আইনসহ বহু আইন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্ব থেকে শুরু হয়ে এখনও বলবৎ রয়েছে, যার বেশীর ভাগই ঔপনবেশিক দর্শনদ্বারা প্রভাবিত।

এটা লক্ষ্যনিয় যে, ব্যবসায়িক বহু আইনের মধ্যে আইনের অস্পষ্টতা ও জটিলতা থাকায় ব্যবসায়ের পরিবেশ সহায়ক হতে পারছে না। তাই দেশের বর্তমান অর্থসামাজিক চাহিদাকে সামনে রেখে জরুরী ভিত্তিতে প্রচলিত আইন পরিমার্জন করে নতুন আইন প্রনয়নের মাধ্যমে অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, আশির দশকে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশেও এর হাওয়া লাগে এবং বিভিন্ন সময়ে সংস্কার কর্মসূচী (Reform Program) হাতে নেয়া হয়। এতে অনেক কঠোর আইন সংস্কার করে ব্যবসায় বন্দর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এখনও এ কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Social and Culturtal Environment)

যে কোন দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সে দেশের ব্যবসায় পরিবেশের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সাংস্কৃতিক বিষয়টি গুনগত বলে এর প্রভাব পরিমাপ করা দূরূহ ব্যাপার; তবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অনুসারে এর প্রভাব বিচার করা যেতে পারে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠার পেছনে সেদেশের শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, প্রথা, রীতিনীতি, প্রভৃতি উপাদানের উপর, আবার কোন কোন উপাদান একটি সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পুরানো সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ সবসময় একটি দেশের শিল্পকারখানা বিকাশে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। পক্ষান্তরে, আধুনিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ব্যবসায়ের বা শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে বি, সি, টেনডন বলেন যে, উন্নয়নশীল দেশের সনাতন মূল্যবোধ জনশক্তির পূর্ণ সদ্বব্যাবহারে নিরুৎসাহিত করে থাকে। এ সমাজের লোকেরা সাধারণত ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়। তাঁরা কোন ইতিবাচক ফলকে ভাগ্যের প্রসন্নতা হিসেবে গণ্য করে ও বিফলতাকে ভাগ্যের বিরূপতাকে দায়ী করে।

তাই, এ ধরণের অনুন্নত সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থা ব্যবসায়িক পরিবেশকে প্রতিকূল অবস্থায় ঠেলে দেয়, নিম্নে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব সৃষ্টিকারী দিকগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

১. **ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতাঃ** এ সকল দেশে জনগণের বধ্যমূল ধারণা যে, ভাগ্যের মূল নিয়ন্ত্রক সৃষ্টিকর্তা। তিনি ইচ্ছা না করলে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা বৃথা। ফলে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের চেষ্টা করার পরিবেশ অনুপস্থিত।

২. **কুসংস্কারে বিশ্বাসীঃ** এ সমাজের মানুষ কোন ব্যবসা শুরু করতে, জমিনে ফসল রোপণ করতে, গৃহ নির্মাণ বা যাত্রা শুরু ইত্যাদি ধর্ম যাযক, পন্ডিত ও রাশি ফল দ্বারা নির্বাচিত কয়েকটি কার্য হাতেগনা দিনে সম্পন্ন করে, ফলে ব্যবসায় শুরুর ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় হয়; এতে ব্যবসা শুরুতেই ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে যায়।

৩. **সামাজিক রীতিনীতিঃ** সামাজিক রীতিনীতিও ব্যবসায়ের উপর প্রভাব ফেলে। উন্নয়নশীল দেশের মানুষ অনুৎপাদন খাতে বেশী বেশী ব্যয় করে; কিন্তু, ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার কথা চিন্তা করতে পারে না। বিয়ে, জমি ক্রয়, বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি কাজে টাকা ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে না; অথচ ব্যবসায়ে টাকা বিনিয়োগের কথা চিন্তা করতে পারে না।

৪. **ঐতিহ্যঃ** সাধারণতঃ দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের মানুষ অতীত ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করে। তাই, ঐতিহ্য বিরোধী কোন কাজে এগিয়ে আসতে নিরৎসাহিত হয়। জমিজমা বাড়ীঘরকে ঐতিহ্য মনে করে তা রক্ষায় স্বচেষ্ট থাকে; অথচ এ থেকে লাভের পরিমাণ একেবারেই নগন্য।

৫. **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থ ব্যয় :** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে টাকা ব্যয় করা সামাজিক দায়িত্ব মনে করে, তাই মসজিদ, মাদ্রাসা, গীর্জা, মন্দিরে টাকা ব্যয় করে অত্মতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু, ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করাকে সামাজিক দায়িত্ব মনে করে না।

৬. **চাকরির প্রতি ঝোঁকঃ** বিশেষ করে সরকারি চাকরি করাকে সম্মানের মনে করে ও নিরাপদ বলে বিবেচনা করে। কিন্তু, শারিরীক পরিশ্রম করতে নিরুৎসাহিত হয়। উপরের চিত্রটি মূলত অনুন্নত সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে যা ব্যবসায়ের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ বলে গণ্য হয়।

কিন্তু, আধুনিক দেশের চিত্র এর সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসকল দেশের রীতিনীতি, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা, অধিক পরিশ্রম ও উন্নত জীবন যাত্রার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম অধিক আয়ের অনুকূল। সেখানে কুসংস্কার, ও ধর্মীয় গোড়ামি নেই; বরং, দৃঢ় মনোবল, ইচ্ছা শক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তনে বিশ্বাসী। বিশেষ করে; শিল্প বিপ্লবের পর পশ্চিমা দেশগুলোতে এ ধরণের অনুকূল পরিস্থিতি ছিল যা এখনও বিদ্যমান। সম্প্রতিককালে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে তুলছে এবং আধুনিক কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু, সেখানেও পরিবর্তন একেবারে নিষ্কন্টক নয়। পরিবর্তনের প্রতি জনগণের যথেষ্ট অনুকূল ও যথাযথ নয়। তাই সেখানেও যেকোন পরিবর্তন জনগণের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতিনীতি এবং বংশগত ঐতিহ্য দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসায় পরিবেশের উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান, যেমনঃ স্বল্পউন্নত, প্রাচীন সমাজ, অনুন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সামাজিক কুসংস্কার, সনাতন সংস্কৃতি, পুরনো ঐতিহ্য, ধর্মীয়গোড়ামী, অন্ধ বিশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা ব্যপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাই, শিল্লোউদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায়ের প্রসার ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিরাজমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে অনুকূল ও সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

ব্যবসায়িক পরিবেশের কারিগরি দিক (Technical Aspects of Business Environment)

যে কোন দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার উৎপত্তি, অগ্রগতি, ইত্যাদি দক্ষশ্রমিক, কারিগরি জ্ঞান এবং সহকারী সেবামূলক কার্যাবলীর সরবারহ ও উপস্থিতির উপর আনেকাংশে নির্ভরশীল। কোন একটি বিশেষ স্থানে বা অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ কারিগর, প্রকৌশলী, দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা, সে স্থানের প্রতি উদ্যোক্তাদেরকে প্রেষিত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলাযায়, প্রাচীন বাংলায় দক্ষ কারিগরের কারণে জগৎ বিখ্যাত মুসলিন শাড়ীর কারখানা গড়ে উঠেছিল। আরও উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, দ্বৈত শহরে (Twin Cities) কারিগর ও প্রকৌশলীর উপস্থিতি শ্রবন যন্ত্র শিল্প স্থাপনে কারিগরি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অনুরূপভাবে, কোন স্থানে দক্ষ শ্রমিকের পর্যাপ্ততা উক্ত স্থানে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের সে স্থানে শিল্প কারখানা স্থাপনে আগ্রহী করে তুলে। তেমনিভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে হিসাববিদ, আয়কর আইনজীবি, আইনজীবি, পরামর্শদাতা, ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিবর্গের সেবার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এ সকল বিশেজ্ঞদের সরবরাহের স্বল্পতা বা পর্যাপ্ততা কোন স্থানে শিল্প কারখানা স্থাপনে যতাক্রমে প্রতিকূল বা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। নিউমাস (Newmus) যে কোন প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্য পরামর্শকগণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব

আরোপ করেন। তিনি মনে করেন যে, পরামর্শদাতাগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্যাবলী চিহ্নিত ও দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পরামর্শদিয়ে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থযোগানোর জন্য প্রস্তাবনা তৈরি ও মূলধন গঠনে পরামর্শকগণ সহযোগিতা করে থাকেন।

বর্তমানে সারাবিশ্বে শিল্পবাণিজ্য ও ভোক্তার পণ্য সরবরাহ অভাবনীয় অগ্রগতিও প্রযুক্তির উন্নয়নেরই ফসল। বৃটেনে শিল্প বিল্পব প্রযুক্তি উন্নয়নের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ফসল। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে প্রায় প্রতিদিনই নিত্য নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার ঘটছে। যার ছোঁয়া ছোট বড়, ধনী-গরীব, উন্নত-অনুন্নত প্রয় সব দেশেই কম বেশী লাগছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে দু' ভাবে প্রভাবিত করছে।

(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ : প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করেছে, ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান বেড়েছে। এতে উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য হ্রাস পাচ্ছে, বাড়ছে ক্রেতা ও বিক্রির পরিমাণ, ফলে ব্যবসায়ীগণ বেশী বেশী মুনাফা অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছে। (খ) কঠিন চ্যালেঞ্জ : পক্ষান্তরে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আবার ব্যবসায়ীদেরকে কঠিন চ্যালেঞ্জে ফেলেছে। বাড়ছে প্রতিযোগিতা; তাই, প্রতিটি ব্যবসায়ী ও ব্যবসা প্রশাসককে প্রযুক্তি উন্নয়নের হালনাগাদ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা কাজে লাগাতে সদা ব্যস্ত ও সজাগ থাকতে হচ্ছে।

সেবিডিথ ও তাঁর সহযোগীদের মতে কোন ব্যবসায় নতুন প্রযুক্তির সাথে কতটুকু সংশ্লিষ্ট থাকে তা নির্ভর করে কতগুলো বিষয়ের উপর। যা নিম্নরূপ:

১. কোন একটি শিল্পকে প্রযুক্তি কিভাবে প্রভাবিত করবে?

২. কিভাবে প্রযুক্তি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায়িক মুনাফাকে প্রভাবিত করবে?

৩. বর্তমান উদ্যোক্তা ও তার কর্মচারীগণ নতুন প্রযুক্তির সাথে কতটুকু সংশ্লিষ্ট হতে পারেন?

বর্তমান উন্নত প্রযুক্তি শুধু উৎপাদন প্রক্রিয়াকেই নয়, বরং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক যোগাযোগ ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকেও প্রভাবিত করে। আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে মুক্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতায় টিকতে না পেরে আমদানীর আশ্রয় গ্রহণ করছে। আর এতে দেশীয় শিল্প বিকাশ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে, আবার শিল্পোদ্যোক্তাগণ উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। আবার, উন্নত প্রযুক্তির ফলে উৎপাদন বাড়ানো, মূল্য হ্রাস, সহজ সরবরাহ ইত্যাদির ফলে শিল্পের বিকাশ তরান্বিত হয়। তবে, স্থানীয় প্রযুক্তির সাথে বিদেশী প্রযুক্তি সমন্বয়সাধনের বিষয়টি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। এখন কতগুলো ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফলপ্রসু হতে পারে, তাই প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। পাশাপাশি, প্রশিক্ষণ ও চাকরিচ্যুতি না করার নিশ্চয়তা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

ব্যবসায়িক পরিবেশের অন্যান্য উপাদান (Other Factors of Business Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশ:

ব্যবসায়িক পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদানগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু সহায়ক উপাদান রয়েছে। যে কোন দেশের সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি নদনদী, জলবায়ু, মাটি, বনসম্পদ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি উপাদান নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। যেমন, বাংলা দেশে সুন্দর বনের কাঠকে সামনে রেখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল স্থাপিত হয়েছে। আবার, ভৌগলিক অবস্থার কারণে নদনদী, সুমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুবিধার কারণে ব্যবসায়ের উন্নতি লাভ করেছে। যেমন, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মংলা, নারায়নগঞ্জ ইত্যাদি।

আর্ন্তজাতিক পরিবেশ:

আধুনিক যুগে বিশ্বায়ন (Globalization)-এর ফলে আর্ন্তজাতিক পরিবেশ যে কোন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপর কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও পূঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভরশীল। আবার আর্ন্তজাতিক সংস্থা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, আইনগত কাঠামো, দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি (সাফটা) অর্থনৈতিক জোট (নাফটা) দুটি দেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি, উদ্বৃত্ত, আর্ন্তজাতিক পরিবেশগত উপাদান যে কোন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আলোচিত উপাদানগুলো ছাড়াও আরো কিছু উপাদান যেমন- পরিবেশ দূষণ, কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা, অবকাঠামো, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যবসায়িক পরিবেশ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নকে প্রভাবিত করে থাকে।

বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ (Business Environment of Bangladesh)

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি ক্ষুদ্র ও দরিদ্রতম দেশ। এ দেশের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এখনও পূরনধাচের। রাজনৈতিক পরিবেশ অস্তিতিশীল ও ঘন ঘন পট পরিবর্তন হয়ে থাকে। শিক্ষার হার সন্তোষজনক নয় মাত্র ৪৫%। অধিকাংশ লোক কৃষি নির্ভর ও গ্রামে বসবাস করে। শিল্পে অনুন্নত ও মন্থর গতি (৬.০৪%) মাথাপিছু আয় কম বেকার সমস্যা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী, খনিজ সম্পদের অভাব, প্রযুক্তির পশ্চাতপদতা, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কম প্রভৃতি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যও প্রতিকূল অবস্থা বিরাজমান। এ সকল উপাদান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। নিম্নে বাংলাদেশের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রভাব বর্ণনা করা হলো:

১. **রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment):** বাংলাদেশ একটি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ। এটি **১৯৭১** সালে স্বাধীনতা লাভ করে। এর পূর্বে **১৯৪৭** সাল থেকে **১৯৭১** সাল পর্যন্ত **২৪** বছর পশ্চিমারা শাসন করে বলে সে সময় এদেশে তাদের থেকে ব্যবসা বণিজ্যের উন্নয়নে খুব কম সহযোগীতা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে তৎকালীন সমায়ে হাতেগোনা কয়েকজন উদ্যোক্তা থাকলেও তারা তেমন সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। যার ফলে, এ সময়ে বাংলাদেশে ব্যবসায়ের তেমন কোন অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেনি।

   কিন্তু, স্বাধীনতার তিন যুগ পরেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে না উঠায় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে না। স্বাধীনতার পর সকল ব্যাংক, বীমা, শিল্প কারখানা রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ব্যক্তি মালিকানায় শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি। '৭৫ সাল পরবর্তি সময়ে বাংলাদেশের তৎকালীন ব্যক্তি মালিকানাধীন করনের মাধ্যমে বেসরকারীভাবে ব্যবসায়ের দ্বার উম্মোচন করে। কিন্তু, ক্ষমতার পরিবর্তন, দূর্নীতি, ব্যাংক অব্যবস্থাপনা, প্রকৃত উদ্যোক্তা চিহ্নিত করণে স্বজনপ্রীতি, ব্যাংক ঋণ ফেরত না দেবার প্রবনতা, ঘন ঘন হরতাল, অবরোধ প্রভৃতি ব্যবসায়ের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত করে। তবে, গণতান্তিক সরকারগুলো শিল্পোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে নতুন শিল্প নীতি ঘোষণা করে ফেলে শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষ্যণ দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়তে এ নীতিমালা সহায়ক হবে।

২. **অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment):** বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে অনুকূল-প্রতিকূল উভয় পরিবেশই বিরাজ করছে। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হবার কারণে পণ্যের বিরাট চাহিদা রয়েছে; যার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যথেষ্ঠ সুযোগ আছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সুলভ কাঁচামাল ও পর্যাপ্ত দক্ষ ও আধাদক্ষ জনগোষ্ঠীও রয়েছে। পুঁজি বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংক, শেয়ার বাজার, বীমা ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানও আছে যথেষ্ট পরিমাণ। সরকারী রাজস্ব নীতি, কর নীতি ও নতুন শিল্প নীতির মাধ্যমে দেশী বিদেশী শিল্প বিনিয়োগকারীদের আর্কষণ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিনিয়োগের উপর রির্টানও বেশ আশানূরূপ। অপর দিকে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি, চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, মুদ্রাস্ফীতি, বিদেশী অনুদান নির্ভরতা, রপ্তানির বেশীর ভাগ কাঁচামাল, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ মডেল অনুসরণ প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করছে। যা এ দেশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও উন্নয়নের পথে বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাঁদাবাজি, ঘন ঘন হরতাল, অতিমাত্রায় মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে দেশী শিল্প বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তার পরও বলা যায় যে, সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা শিল্প পরিবেশকে অনুকূলে আনার চেষ্টা করছে।

৩. **আইনগত পরিবেশ (Legal Environment):** দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনুকূল ব্যবসায় পরিবেশের সহায়ক। সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্নধরণের আইন প্রনয়ন করা হয়েছে । যার মধ্যে, কলকারখানা আইন, শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ আইন, শিল্প সম্পর্ক আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, মাতৃত্ব কল্যাণ আইন, ইত্যদি উল্লেখযোগ্য। আবার বাণিজ্যিক আইনের মধ্যে অংশীদারী আইন, কোম্পানী ব্যাংকিং আইন, আমদানি রপ্তানি আইন ইত্যাদি আইন রয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকায় ব্যবসায়ীগণকে প্রায়ই দূর্ভোগ পোহাতে হয়। ঋণ খেলাপীর ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না থাকার ফলে একদিকে ব্যবসায়ীরা আইন অমান্য করে চলেছে; অন্য দিকে, চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাসীর কারণে ব্যবসায়ীগণ উৎসাহ পাচ্ছে না। তাই বলা যায় দেশের আইন শৃঙ্খলা ব্যবসায়ের অনুকূল নয় বলে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাগণ পুরোপুরি আস্থা পায় না বলে সন্তোষজনক বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে না।

৪. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Socio-cultural Environment):** কোন দেশের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ব্যবসায় পরিচালনা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কৃষ্টি একটি গুনাগত বিষয়, যা কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না; কিন্তু, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অনুমান করা যায়। উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলোর উৎপাদনশীলতা অনেকগুন বেশী। তার জন্য অর্থসামাজিক পরিবেশ অনেকাংশে দায়ী।

সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলতে কোন দেশের লোকজনের আচারআচরণ, চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস, স্বভাব, মানসিকতা, শিক্ষা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, ইত্যাদিকে বুঝানো হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের মানুষ সনাতন চিন্তাধারা পোষণ করে, নতুনকে সহসা গ্রহণ করতে চায় না, কম পরিশ্রমী, ভাগ্য নির্ভরশীল, বংশ গৌরব ও সামাজিক গর্ববোধ কাজ করে। উৎপাদন কাজে অর্থ ব্যয়ে আগ্রহী কম, ঝুঁকিগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। এদেশে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, যেমনঃ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি দ্বারা প্রায়সই আক্রান্ত হয় এবং বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, সেগুলো কোন দেশের শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়ক নয়। তাই এদেশে শিল্প সহায়ক পরিবেশ গড়ে উঠার জন্য কিছু কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে যা নিম্নরূপঃ

(ক) চাঁদাবাজি বন্ধ করা;
(খ) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বাদে বিলাস দ্রব্য আমদানি বন্ধ রাখা;
(গ) দেশীয় উৎপাদিত পণ্য রক্ষার্থে অনুরুপ বিদেশী পণ্য বন্ধ রাখা;
(ঘ) ঘুষ প্রদান ও গ্রহণ প্রভৃতি বন্ধের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা;
(ঙ) পরিশ্রমী ও ঝুঁকি গ্রহণের মানুসিকতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

৫. **প্রযুক্তিগত পরিবেশঃ** বর্তমান আধুনিক যুগকে প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। যে দেশ প্রযুক্তিতে যত উন্নত, সে দেশ ব্যবসা বাণিজ্যেও তত উন্নত। বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত দিক পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এ দেশের প্রযুক্তি পুরোন এবং অনেক ক্ষেত্রে এখনও মানদাতার আমলের প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করছে। দেশের বেশীরভাগ লোক প্রযুক্তি জ্ঞানহীন ও অদক্ষ ও আধাদক্ষ। শিক্ষার হার কম। আর প্রযুক্তিগত শিক্ষা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। তাই ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আরও উন্নত প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে। দেশের প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। অদক্ষ জনগণকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানস্পন্ন রূপে রূপান্তর করে বিদেশী নির্ভরশীলতা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ অনুপস্থিত; তাই, ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানোর জন্য অতিদ্রুত ব্যবসায়িক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কার্যকর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পাঠসংক্ষেপ

একটি ব্যবসায়ে যে সকল উপাদান প্রভাবিত করে, সেগুলোর সমষ্টিই ব্যবসায় পরিবেশ। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদানগুলোর মধ্যে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আইনগত, সরকারী নীতি, প্রতিযোগী, সরবরাহকারী ইত্যাদি। ব্যবসায়ের পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ ব্যাষ্টিক পরিবেশ ও সামষ্টিক পরিবেশ। ব্যষ্টিক পরিবেশের মধ্যে কোম্পানী, সরবরাহকারী, মধ্যস্থকারী, ক্রেতাসাধারণ, প্রতিযোগী, ও জন সাধারণ। পক্ষান্তরে, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো হচ্ছেঃ জনসংখ্যা পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রযুক্তিগত পরিবেশ ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ। এ পরিবেশগুলোর অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার কারণেই ব্যবসায়ের সফলতা-ব্যর্থতা আনেকাংশে নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১.ব্যবসায়িক পরিবেশ বলতে কি বোঝেন?

২.বাংলাদেশের শিল্প পরিবেশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিল্পোদ্যোগের পরিবেশের উপাদনগুলো বর্ণনা করুন।
২. ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবেশর প্রভাব বর্ণনা করুন।
৩. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের বিভিন্ন দিকগুলো বর্ণনা করুন।
৪. বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ-৩ ঃ বাংলাদেশের শিল্পনীতি (Industrial Policy of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্পনীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিল্প নীতি ২০০৫ এর উদ্দেশ্যগুলো বলতে পারবেন;
- শিল্পনীতির নীতির কৌশল সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন;
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন;
- বেসরকারী খাত সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সরকারী খাত সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন;
- সরকারী খাত ও বেসরকারীকরণ নীতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্পের বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্পায়ানে মহিলা উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বিকাশে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শিল্পনীতি (Industrial Policy)

যে কোন সরকার সংশ্লিষ্ট দেশের নতুন নতুন শিল্প-উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শিল্পায়ন গতিধারাকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনের নিরীক্ষে সময় সময় শিল্প নীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে থাকে। একটি সুষ্ঠু ও বাস্তব ভিত্তিক শিল্পনীতি কোন দেশের উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ ও ১৯৮৬ সালে দুটি শিল্পনীতি ঘোষণা করে; তার পর ১৯৯৯ সালে আবার নতুন করে শিল্প নীতি ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে সর্বশেষ শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় যা বর্তমানে প্রচলিত আছে।

শিল্পনীতি ২০০৫ এর উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Industrial Policy 2005)

২০০৫ সালের শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে অপরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বহির্বিশ্বে রপ্তানির সম্ভাব্যতার নিরিখে পরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান শিল্প নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বমানের প্রেক্ষাপটে বেসরকারী উদ্যোক্তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে দেশে সুষ্ঠু শিল্পায়নে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের সহায়ক ভূমিকা তুলে ধরা।

৩. সরকারি মালিকানাধীনে পরিচালিত শিল্পকারখানাসমূহ বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় কর্তৃক বিক্রয়/হস্তান্তর/লীজ প্রদান বা অন্য কোন পদ্ধতিতে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. শিল্পোন্নয়নে যেসব ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ এগিয়ে আসছেনা; কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এসব শিল্প কারখানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে, সেসবক্ষেত্রে সরকার বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে অথবা সেটা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরকার এককভাবেই শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৫. স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারে দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রসার ও ভোক্তার রুচি সম্মত শিল্প পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে (ক) বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন (খ) পণ্য উৎপাদনের কষ্ট-ইফেকটিভ (Cost-Effective) ব্যবস্থপনার অনুসরণ (গ) শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর মূল্য সংজোযোন এবং (ঘ) ধারাবাহিক, যথোপযুক্ত ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দান।

৬. জাতীয় অর্থনীতিতে মোট উৎপাদন (G.D.P), শিল্পখাতে অবদান বৃদ্ধি এবং দেশীয় ভোক্তা সাধারণের চাহিদা মেটান ও অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা এবং বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগীতামূলকভাবে শিল্প পণ্যের প্রবেশে সহায়তা প্রদান।

৭. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুটির এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী (এস,এম,আই) শিল্পের দ্রুতসম্প্রসারণ এবং এ খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করে দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচী সাফল্যজনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

৮. কৃষি ভিত্তিক ও কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসেবে পোলট্রি, ডেইরী, এবং গোটশীপ অধিক হারে সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান।

৯. মহিলা উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে শিল্প কারখানা স্থাপনে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।

১০. শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রমন্বয়ে উচ্চতর মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

১১. শিল্প ক্ষেত্রে দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব শিল্পপণ্য উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।

১২. দেশে স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ এবং অধিক হারে উচ্চমূল্য সংযোজিত রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্প উপখাতে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ধিত হারে পশ্চাৎসংযোজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠা।

১৩. দেশের বিবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজসম্পদসমূহ যথাযথ ব্যবহার করে শিল্প খাতকে আরো সমৃদ্ধি করা।

নীতি কৌশল (Policy Strategy)

২০০৫ সালের নতুন শিল্প নীতির অধ্যায়-৩ এ নীতি কৌশলগুলো নিম্নরূপ বর্ণিত আছে:

১. শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান উৎপাদনক্ষমতার সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করা। বিশেষ করে, অবকাঠামগত অপ্রতুলতা বা ক্রুটির কারণে উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাত্নক ব্যবহার যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

২. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুটির এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী (এম এস আই) শিল্প উন্নয়নের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি অবকাঠামগত সুবিধা প্রদান।

৩. কৃষি ভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্প স্থাপন এবং এর ক্রমবিকাশকে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামগত সুবিধা প্রদান করা।

৪. বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য যাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা যায়, সে ক্ষেত্রে হিমায়িত, পাস্তুরিত, কৌটাজাত (Canned) কিংবা শুষ্ক খাদ্য হিসেবে শিল্পজাত/প্রক্রিয়াজাত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা; যাতে করে দেশে এসমস্ত শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্র আধুনিক ও মানসম্মত সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন করে সারা বছরই বাজারে সরবরাহ কিংবা রপ্তানি করা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. দেশে যেসব প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে, বিশেষ করে গ্যাস, কয়লা, কঠিন শীলা, চুনাপাথর এবং বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে বিদ্যমান সিলিকন, মোনাজাইট, জিরকন, রুটাইল, ঝিনুক, মুক্তা, প্রবাল, জীবাশ্মা, সি-ইউডস ইত্যাদি যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে নতুন নতুন অর্থকারী শিল্প স্থাপন সম্ভব সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. দেশে ব্যাপকভিত্তিতে সৌরশক্তি ও বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল গার্বেজ ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পরিচালনার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ।

৭. পণ্য বহুমুখীকরণ ও বিশ্বমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনসহ অধিকতর মূল্য সংযোজনী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে রপ্তানি শিল্প পণ্য বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পশ্চাৎ সংযোগকারী শিল্প পণ্য উৎপাদনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান।

৮. দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে তৈরি পোষাক ও বস্ত্র শিল্পকে অন্যান্য অগ্রাধিকার খাতের ন্যয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা।

৯. মূল্য সংযোজনকারী সংযোগ শিল্প (Linking Industries) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপঠিকাদারী (Subcontracting) শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

১০. শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্জ হ্রাস (Waste Minimization), বর্জ অপসারণ এবং সর্বোপরি পর্যায়ক্রমে দূষণমুক্ত পণ্য উৎপন্ন করার লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সহযোগীতা প্রদান করা।

১১. স্থানীয় বাজারে শিল্প পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পের দক্ষতা ও সক্ষমতাকে অধিকতর শক্তিশালী ও উৎসাহিত করা।

১২. উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রনোদনা প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী সুষম শিল্পায়নে উৎসাহিত করা।

১৩. শিল্পক্ষেত্রে দায়ভারগ্রস্থ রুগ্ন শিল্পের পূর্নবাসন ও উন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে স্থানীয় বাজারে রুগ্নশিল্পে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নিরুপণের উদ্দেশ্যে সমীক্ষাকার্যক্রম গ্রহণ। একইসাথে স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগীতার পেক্ষাপটে রুগ্নশিল্পে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে কষ্ট-ইফেকটিভ পদ্ধতি প্রয়োগসহ গুনগত মানের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

১৪. শিল্পখাতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।

১৫. রাষ্ট্রীয় খাতের অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত ও পর্যায়ক্রমে বেসরকারীকরণ করা। যেসব ক্ষেত্রে সরকার বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প পরিচালনা নিরাপদ মনে করেন না, শুধু সে ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় শিল্প বিনিয়োগ ও পরিচালনা সীমাবদ্ধ রাখা।

১৬. শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

১৭. বন্দর সুবিধা, শক্তি খাত, যানবাহন, ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। এসব খাতে নির্মাণ, পরিচালনা ও স্বত্বগ্রহণ এবং নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর পদ্ধতিসহ ব্যক্তি বিনিয়োগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা।

১৮. দেশে ইতোমধ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বেশ কিছু শিল্প কারখানা বেসরকারী মালিকানায় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়েছে; এসব শিল্প উপখাতে অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিল্পসম্পর্ক স্থাপনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

১৯. অধিকতর কাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিবিড় শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের পাশাপশি স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, উপকরণ লভ্যতা এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প এলাকা গড়ে তোলা।

২০. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এবং বিভিন্ন চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

২১. কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক বীজ প্রজনন, উৎপাদন, বর্ধন ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে শিল্পহিসেবে গণ্য করা। একইসাথে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে জোরাল পদক্ষেপ গ্রহণ।

২২. নিত্য ব্যবহার্য কতিপয় প্রধান খাদ্যসামগ্রী যেমন আটারকলগুলোতে গম থেকে উৎপাদিত আটা, অপরিশোধিত ভোজ্য তেল থেকে পরিশোধিত তেল, অবিচুন্ন/অপরিশোধিত লবন থেকে পরিশোধিত লবন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ভিটামিন, মিনারেল ও আয়োডিন সমৃদ্ধ করে বাজারজাতকরণ।

২৩. গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব লাগসই প্রযুক্তির উন্নয়ন, গ্রহণ, ও হস্তান্তরে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা। একইসাথে সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তি উন্নয়নে বাজারমুখী প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলা।

২৪. প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

২৫. শিল্প মন্ত্রনালয়ের তত্ত্বাবধানে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সহ (বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ) একটি সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক ব্যবস্থাপনা তথ্য সার্ভিস (MIS) কেন্দ্র স্থাপন করা এবং এ তথ্য কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

২৬. শিল্প উৎপাদনক্ষমতা সৃজনে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তহবিল এবং সৃজনশীল শিল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা দেবার জন্য ভেঞ্চার কেপিটাল (Venture Capital) সৃষ্টি করা।

২৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত প্রযুক্তি বিস্তার বা প্রযুক্তি (Desmination) কোষ (Cell), শিল্প ও ব্যবসায়ী সমিতি এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনে শিল্পোন্নয়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, প্রযুক্তি আহরণ, ও প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৮. ব্যবসায়িক বিবাদ (Traddipates) দ্রুত এবং কম খরচে নিস্পত্তির জন্য সম্প্রসারিত প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থায় (অর্থ ঋণ আদালত, আরবিট্রেশন সেন্টার ও বিবিধ ট্রাইবুনাল ইত্যদি) সহায়তা দেয়া।

২৯. অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে যাতে সময়মত চলতি মূলধন পাওয়া সম্ভব হয়, সে বিষয়ে শিল্প স্থাপনের শুরুতেই চলতি মূলধন প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিতা করা।

৩০. শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা কিংবা পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলধনের অপর্যাপ্ততা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে শিল্প-উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পুঁজি বাজারের সহায়তা গ্রহণের বিষটি নিশ্চিত করা।

৩১. শিল্পসংক্রান্ত অন্যান্য নীতি যেমন-বস্ত্রনীতি, পাটনীতি, রেশমনীতি প্রভৃতি নীতি শিল্পনীতির পরিপূরক হিসেবে বিবেচনায় রাখা।

৩২. আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ দেশের ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কোন বৈষম্য থাকলে তা দূর করা।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

(Definition and Classifications of Industrial Establishments)

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রযোজ্য শিল্পনীতি ২০০৫ এর অধ্যায়-৪ এ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপভাবে করা হয়েছে:

১. ব্যাপক অর্থে উৎপাদন ও সেবা এ দুধরণের কর্মকান্ডই শিল্প হিসেবে সংজ্ঞায়িত।

২. উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরিবর্তিতে উৎপাদিত পণ্যের মেরামত, পূন:সংস্কারসাধন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক কাজসমূহও শিল্পের অর্ন্তভূক্ত।

৩. যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পাদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব সেবাকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব সেবা কর্ম শিল্পের অর্ন্তভূক্ত। যেসব সেবাকর্মকে বর্তমানে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তা হলো : হাসপাতাল ও ক্লিনিক, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কর্যক্রম, কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড যেমন- মৎসআহরণ, মৎস সংরক্ষণ ও বিপণন, টেলিকমিউনিকেশন, পরিবহন ও যোগাযোগ, বনশিল্প ও ফর্নিচার, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, কনস্ট্রাকশণ বিজনেস, বিনোদন, ফোটগ্রাফি, হোটেল ও পর্যটন, অয়্যারহাউস ও কনটেইনার সার্ভিস, প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, গিনিং ও বেলিং, ল্যাবরেটরী, কোল্ড স্টোরেজ, হর্টিকালচার, ফুলচাষ ও ফুল বাজারজাতকরণ, খাদ্য শস্য ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাত করণ, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতা সম্পন্ন নলেজ সোসাইটি।

৪. ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শিল্পের সংজ্ঞা:

(ক) 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন বাদে অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্যের প্রতিস্থাপন ব্যয় (Replacement Cost) ১০ কোটি টাকার অধিক।

(খ) 'মাঝারী শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যে সব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যাতিরিকে অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য/প্রতিস্থাপন ব্যয় ১.৫০ কোটি টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা।

(গ) 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে, যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরিকে অন্যান্য সম্পদের মূল্য/প্রতিস্থাপন ব্যয় ১.৫ কোটি টাকার নিচে।

(ঘ) 'কুটির শিল্প' বলতে এরুপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ অথবা খন্ডকালীন সময়ে উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত।

৫. নন-ম্যানুফ্যাকচারিং (ট্রেডি এবং অন্যান্য সেবা) খাতে শিল্পের সংজ্ঞা:

(ক) 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে, যেসব প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে।

(খ) 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে ২৫ থেকে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে।

(গ) ‘ক্ষুদ্র শিল্প’ বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে ২৫ জনেরও কম শ্রমিক কাজ করে (কুটির শিল্পের মত পরিবারের লোকজন নয়)।

৬. সংরক্ষিত শিল্প: সরকারী নির্দেশের মাধ্যমে যেসকল শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল, সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমান শিল্পনীতিতে সংরক্ষিত শিল্প খাতগুলো নিম্নরূপ:
অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, পারমানবিক শক্তি, সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল, বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ।

৭. অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প: ‘অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প’ (Thrust Sector) বলতে সেসব শিল্প/শিল্প উপখাতকে বুঝাবে, যেসমস্ত শিল্প/শিল্প উপখাত দেশে ইতোমধ্যে সুষ্ঠু শিল্পায়নে তথা মোট অভ্যান্তরীণ উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দারিদ্র বিমোচনে সাফল্যজনক ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ বিশেষ প্রণোদনা, (Special Incentive) ও আর্থিক সহায়তা যেমন- শুল্ক বা কর অব্যাহতি (Tax Examption) দ্বৈতকর প্রদান থেকে অব্যহিত, কর অবকাশ সুবিধা প্রদান, এবং ভবিষ্যতে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে যদি কর অবকাশ সুবিধা ও কর অব্যাহতি প্রদান সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে করারোপ কিংবা ত্বরান্বিত অবচয় সুবিধা প্রদান (Accellarated Depreciation) বিষটি বিবেচনা করা যেতে পারে। দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার, আমদানী প্রতিস্থাপন, উপ-যোজন, অথবা রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসহ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলেও প্রদান করা যেতে পারে। তবে, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতের আওতায় শিল্পোদ্যোক্তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatically) এসমস্ত সুবিধা পাবে। জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ করে শিল্পতে অগ্রাধিকার উপখাত/ শিল্প কারখানাসমূহের অবদান এবং পারফরমেন্স বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সরকার অগ্রাধিকার খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাসমূহ নির্ধারণ করবেন। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমূহ নিম্নে দেখানো হলো: কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, বস্ত্রশিল্প, পাটজাত ও পাটমিশ্রিত পণ্য, তৈরি পোষাক শিল্প, কমপিউটার সফটওয়ার এবং আই,সি,টি পণ্য, ইলেকট্রনিকস, অটোমোবাইলসহ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিটিক্যাল পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, সিরামিক, উচ্চমূল্য সংযোজিত পোশাক, চা ও রেশম শিল্প, খেলনা, পর্যটন, বেসিক কেমিক্যাল/শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত রং, এবং রাসায়নিক দ্রব্য, চশমা ফ্রেম, ফার্নিচার, লাগেজ ফ্যাসনজাত দ্রব্য, কসমেটিকস ও টয়লেট্রিজ, সি,আর, কয়লা, হস্ত শিল্প পণ্য, ষ্টেশনারিদ্রব্য, ভেষজ ঔষধ শিল্প, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন, হর্টিকালচার।

তবে উল্লেখ্য যে, সময় ও অবস্থানগত পরিবর্তনে উপরে উল্লেখিত শিল্পের সংজ্ঞাসমূহের পরিবর্তনের বিধান রাখা হয়েছে।
রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প রিরাষ্ট্রীকরণ ও প্রইভেটাইজেশন কমিশন।

রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্পগুলোকে ক্রমান্বয়ে বিরাষ্ট্রীয়করণ করার ব্যাপারে বর্তমান শিল্প নীতির অধ্যায় -৬ এ বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

ক. সরকারী খাতের শিল্প কলকারখানা বেসরকারীকরণের বর্তমান নীতি গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করা হবে।

খ. রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ‘সংরক্ষিত খাতে’ সীমাবদ্ধ থাকবে। ভবিষ্যতে শিল্পখাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগকে অবশেষ (Residual) বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করা হবে। রাষ্ট্র ও শিল্পকে ব্যক্তি খাতে পরিপূরক ও প্রতিযোগী হিসেবে উৎসাহিত করা হবে;

গ. বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় শিল্পকে সঠিক বাণিজ্যি নীতির মাধ্যমে পরিচালিত করার জন্য যতদূর সম্ভব স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতে হবে।

ঘ. সংরক্ষিত শিল্পখাত ব্যাতিত রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশসমূহের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে ক্রমান্বয়ে পুজি প্রত্যাহার করা হবে।

ঙ. প্রযোজনবোধে শেয়ার ও সিকিউরিটি বন্টনের বিষয়কে যতদূরসম্ভব ব্যাপকভিত্তিক করা এবং তাদের শিল্প ব্যবস্থাপনায় জড়িত করার জন্য সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি করা হবে।

চ. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের বিদেশী মুদ্রায় এসকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

ছ. প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক কোন কারণে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানা সফল ভাবে বেসরকারী করণ/হস্তান্তর / লীজ প্রদান বা অন্যকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. প্রাইভেটাইজেশন ও বেসরকারী নীতিমালা : প্রাইভেটাইজেশন ও বেসরকারী নীতিমালা সম্পর্কে অত্র শিল্প নীতিতে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে: জাতীয় অর্থনীতিতে বেসরকারীকরণ সেক্টরের ভূমিকা জোরদার করণ উন্নয়নের মুখ্য বাহক হিসেবে বেসরকারী সেক্টরে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রুগ্ন ও ক্রমপরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুত বেসরকারীকরণের মূল উদ্দেশ্যসমূহ: ক) দক্ষতা বৃদ্ধিরসাথে সামাজিক কল্যাণ, খ) বৈদেশিক বিনিয়োগ অর্জন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন, গ) রাজস্ব প্রাপ্তি ঘ) লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে সম্পদ অবমুক্ত করে অন্যান্য সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ, এবং ঙ) প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তা সংরক্ষণ করা।

৯. বেসরকারীকরণের অনুসৃতব্য বা নীতি সমূহ: বেসরকারীকরণের জন্য যে সমস্ত নীতি অনুসরণ করা হয় তা হলো: ক) শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, খ) ক্রেতার পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার গুরুত্ব, গ) সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ধ পরিহার করা, ঘ) বাজার দর বিক্রয় মূল্য হিসেবে বিবেচনায় রাখা, ঙ) ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, চ) হস্তান্তর দলিল বা চুক্তিপত্র সম্পাদন, ছ) স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা রক্ষাকরণ ও পক্ষপাতহীন আচরণ করা।

১০. প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী: ক) বেসরকারীকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন, খ) বেসরকারীকরনের জন্য চিহ্নিত শিল্প/বাণিজ্য/সেবা প্রতিষ্ঠানসমহের মূল্যায়ন, গ) বেসরকারীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের দিক নির্দেশনা প্রনয়ন, ঘ) দরপত্রের মাধ্যমে শিল্প কারখানা বিক্রয়, ঙ) স্টকএক্সেঞ্জ এর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছে আংশিক শেয়ার হস্তান্তর, চ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর সরকারী শেয়ার বিক্রয়, ছ) ব্যবস্থাপনা চুক্তি সম্পাদন, জ) ইজারা প্রদান, ঝ) সরকারী সম্পদ বিক্রয়/ লিকুইডেশন, ঞ) বেসরকারীকরণ কার্যক্রম অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং ট) বেসরকারীকরণকৃত প্রতিষ্ঠানের দখল ফেরত গ্রহণ।

শিল্প উন্নয়নে রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা

শিল্পনীতি ২০০৫ এ দেশে শিল্প উন্নয়নের জন্য নিম্ন লিখিত রাজস্ব ও আর্থিক সুবিধা রাখা হয়েছে:

১. রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতে প্রতিষ্ঠিত একইধরণের শিল্পের জন্য শুল্ক ও করের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকবে না।

২. (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থার উপর নির্ভর করে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কর অবকাশ সুবিধা প্রদান বিদ্যমান রাখা হয়। সরকারের সিদ্ধান্তের উপর ২০০৫এর পর কর অবকাশের সুবিধা বিষয়টি নির্ভরশীল। তবে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত ইউনিটের ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধা প্রযোজ্য হবে না। করমুক্ত আয়ের নূন্যতম ৪০ শতাংশ পূন:বিনিয়োগ করতে হবে।

(খ) কর অবকাশ সুবিধার বিকল্প হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্লান্ট ও মেশিনারীর মূল্যের উপর ১০০% হারে প্রথম বছর অবচয় সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। এ ছাড়া কর অবকাশ সুবিধাপ্রাপ্ত বিকল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত ইউনিটের প্লান্ট এবং মেশিনারীর উপর প্রথম বছর ৮০ ভাগ এবং দ্বিতীয় বছর ১০ ভাগ হারে অবচয় সুবিধা প্রদান করা হবে।

(গ) নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যদি কর অবকাশ সুবিধা ও কর অব্যাহতি প্রদান সম্ভব না হয়, তবে সেক্ষেত্রেহ্রাসকৃত হারে করআরোপের বিষয়ে বিবেচিত হবে।

(ঘ) কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও কম্পিউটার সফ্টওয়ার ব্যবসায়ের আয় ১ জুলাই ২০০২ থেকে ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি দেয়া হয়।

(ঙ) বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য ঋণ ইকুইটি অনুপাতে যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করা হবে।

(চ) রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ হতে ১০ বছরের জন্য আয়কর অব্যাহতির সুবিধা বিদ্যমান রাখা হয়েছে।

(ছ) কর অবকাশ সুবিধার বিকল্প হিসেবে ১ জুলাই ২০০২ থেকে ৩০ জুন ২০০৫ তারিখের মধ্যে স্থাপিত শিল্পের জন্যহ্রাসকৃত ২০% হারে করারোপের সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

(জ) তৈরি পোষাক উৎপাদনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে রপ্তানি আয়ের জন্য ৩০জুন ২০০৬ পর্যন্তহ্রাসকৃত ১০% হারে, পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের আয় ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত ১৫%হ্রাসকৃত হারে এবং বস্ত্র উৎপাদনের সাথে জড়িত শিল্পের আয় ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত ১৫%হ্রাসকৃত হারে করারোপের সুবিধা বিদ্যমান রাখা হয়েছে।

(ঝ) শিল্পায়নের ক্ষেত্রে স্বল্প ও দীর্ঘ ঋণের উপর সুদের হার নূন্যতম পর্যায়ে রাখার জন্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা হবে।

৩. যন্ত্রপাতির উপর রেয়াতী শুল্ক প্রদানের জন্য বর্তমান কাঠামো কার্যকর থাকবে। আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ প্রচলিত শর্ত সাপেক্ষে মূল্য সংযোজন কর থেকে অব্যাহতি পাবে। অনুন্নত এলাকায় শিল্প উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি ইতোমধ্যে গঠিত Equity and Entreprenuership Fund (EEF) এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে এবং বিসিক শিল্প নগরীর শিল্পোদ্যোক্তাগণ এতহবিল প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন।

৪. আমদানিকৃত কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য, ও উৎপন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক কাঠামো ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত হবে।

৫. দেশজ উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী ও আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা দূর করার জন্য প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান শুল্ক করের হার যৌক্তিকি করণ করা হবে। কোন পণ্য অযৌক্তিক ও উৎপাদন ব্যয় সাপেক্ষে কম মূল্যে (Dumping Price) বে আইনীভাবে আমদানিকৃত হলে সে ক্ষেত্রে দেশীয় পণ্য ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ নিয়ে এন্টি ডাম্পিং (Antidumping) প্রয়োগ করে কাউন্টারভেইলিং ডিউটি (Counterveiling duty) আরোপের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬. রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ১০০% বৈদেশিক বিনিয়োগ যৌথ উদ্যোগে (Type-B) এবং স্থানীয় উদ্যোগে (Type-C) স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহ বিনিয়োগ বোর্ডের পূর্ব অনুমতিক্রমে বিদেশী ঋণদাতার সাথে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। উক্ত এলাকায় অবস্থিত ১০০% বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প ইউনিটসমূহ (Type-A) পূর্ব অনুমতি ব্যাতিত বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এসকল ঋণের আসল ও সুদ বাবদ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই পরিশোধ করা যাবে।

৭. অনাবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের বিদেশী বিনিয়োগকরীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রাথমিক সাধারণ শেয়ার (Initial Public Offer) এর ক্ষেত্রে সিকিরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অনাবাশী বাংলাদেশীদের জন্য ১০% শেয়ার সংরক্ষণ করবে। এছাড়া তারা অনাবাসী বৈদেশিক মূদ্রা সঞ্চয় একাউন্টে (NFCD) বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে পারবেন।

৮. "অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প খাত" হিসেবে চিহ্নিত শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারী (এস এম ই) এবং কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে রাজস্ব সুবিধা প্রদান করা হবে।

৯. বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধণকৃত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নতুন শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে জমি হস্তান্তরের জন্য কিংবা কোন শিল্পকে লি:কোম্পানীতে রূপান্তরিত করতে কোনো ট্রান্সফার ফি ও লাভকর (Gain tax) প্রদান করতে হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, উপরোক্ত হস্তান্তরের পর মালিকানা কাঠামোতে কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

১০. বাংলাদেশ ব্যাংকে শিল্প তহবিল সৃষ্টি, বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের সুসংহতকরণ, দেশ তহবিল (Country fund) প্রতিষ্ঠা, মূলধন বাজার সম্প্রসারণ, উদ্যম তহবিল সৃষ্টিকরণ এবং কর অবকাশ ব্যবস্থা যৌক্তিকীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

শিল্পায়নে মহিলা উদ্যোক্তাদের অংশ্রগহণ ও বিকাশ

শিল্পনীতি ২০০৫ এর **১১**নং অধ্যায়ে মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বিকাশের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে :

১. বিগত দশকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে বিশেষ করে শিল্পায়নের কর্মকান্ডে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সাফল্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সে লক্ষ্যে দেশের শিল্প উন্নয়নে বর্ধিতকলেবরে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়।

২. দেশের সর্বত্র স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতর মহিলা উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৩. মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রাক বিনিয়োগ পরামর্শদান এবং প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মহিলা উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠায় আরো বেশী উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিবিধ ইনসেনটিভ ও আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা নেওয়া।

৫. মহিলা উদ্যোক্তাদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার প্রেক্ষাপটে এস এম আই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কারিগরি, আর্থিক ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হবে, এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রনালয়ের আওতায় স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যেমন- বিসিক, বিটাক, বি আই এস, এনপিও, স্কিটি) এর সহায়তায় মহিলা উদ্যোক্তাদের বর্ধিত কলেবরে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬. সার্ভিস ইন্ডাট্রিজ এর সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের অধিক হারে প্রাধান্য দেয়া হবে।

৭. দেশের কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের আগ্রহী করে তোলা হবে। অনুরূপভাবে গর্মেন্টস শিল্প (নীট ও ওভেন), ইলেকট্রনিক্স, সিরামিক, হোসিয়ারী, হিমায়িত খাদ্য, হিমাগার, হাই-ভ্যালু-এডেড শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮. ভোকেশোনাল সামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য, এমব্রোয়েডারী, ইমিটেশন, ব্লক-বাটিক, হস্তশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, খেলনা, উপহারসামগ্রী ইত্যাদিতে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের অধিকহারে উৎসাহ ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৯. দেশে মানসম্পন্ন মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একই সাথে যথোপযুক্ত পুঁজি সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টিকরে এস এম ই এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগীয় শহরে শিল্প পার্কসমূহে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু প্লট সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১০. মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের মানউন্নয়ন, নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি, পণ্যের প্রচার, প্রসার, স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১১. শিল্প উন্নয়নে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের বিষটি নিশ্চিত করা হবে।

১২. মহিলা উদ্যোক্তাদের শিল্প ঋণ, ইকুইটি ক্যাপিটাল, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, চলতি মূলধন ইত্যাদি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোগে দেশে একটি পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা, এবং মহিলা শিল্পোদ্যোক্তদের উপযুক্ততা যাচাই করে সহজ শর্তে বন্ধকী মুক্ত (Colateral Free) ঋণ প্রদানের বিষটি বিবেচনা করা হবে।

পাঠসংক্ষেপ

যে কোন সরকার তার সংশ্লিষ্ট দেশের নতুন নতুন শিল্প-উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শিল্পায়ন গতিধারাকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনের নিরীক্ষে সময় সময় শিল্প নীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে থাকে। একটি সুষ্ঠু ও বাস্তব ভিত্তিক শিল্পনীতি কোন দেশের উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিল্পনীতি বলতে কি বোঝেন?

২. ২০০৫ সালের শিল্পনীতির উদ্দেশ্যগুলো কি?

৩. প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের কাজ কি?

৪. ২০০৫ সালের শিল্প নীতিতে মহিলা উদ্যোক্তাদের কি কি বিশেষ সুবিধার কথা বলা হয়েছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ২০০৫ সালের শিল্প নীতি অনুসারে শিল্প সংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করুন।

২. ২০০৫ সালের শিল্প নীতিতে যেসকল রাজস্ব ও আর্থিক প্রনোদনার কথা বলা আছে তা বর্ণনা করুন।

৩. বর্তমান শিল্প নীতিতে মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও শিল্পে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

৪. ২০০৫ সালের শিল্প নীতির উদ্দেশ্য ও নীতি কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ-৪ ঃ পরিবেশ মূল্যায়ন (Assessing Environment)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- পরিবেশ বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পরিবেশ মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ বলতে পারবেন;
- স্থানীয় সম্প্রদায় মূল্যায়ন কিভাবে করে তা বলতে পারবেন;
- কিভাবে ব্যবসায় পরিবেশ মূল্যায়ন করে তা বলতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক পরিবেশ মূল্যায়ন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ বলতে পারবেন;
- ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশ মূল্যায়ন কিভাবে করা হয় তা জানতে ও বলতে পারবেন ।

বিষয়বস্তু

পরিবেশ বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Environmental Scanning Procedure)

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করার পর এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা একজন উদ্যোক্তার দায়িত্ব। এ তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা যায়। যেমন: প্রাথমিক তথ্য ও পরোক্ষ তথ্য।

পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন এবং যে কোন ধরণের প্রকাশিত তথ্যই পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে, প্রাথমিক তথ্যের উৎসগুলোর মধ্যে ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠী, ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক সম্প্রদায়, সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ, সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বাজার গবেষণা ও অর্থনৈতিক জরিপ করা যায়; আর এর হাতিয়ার হিসেবে প্রশ্নমালা বা চেকলিষ্টের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। আবার ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াজাত ও বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রির্পোট তৈরি করা হয়। নিম্নে অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন তৈরির পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করা হলো:

১. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও সিদ্ধান্তসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এধরণের সকল অর্থনৈতিক উপাদানগুলো সনাক্ত করা;

২. প্রথম ধাপে সনাক্তকৃত উপাদান ও চলকগুলো সম্পর্কে তথ্যের উৎসগুলো চিহ্নিত করে তার একটি তালিকা তৈরি করা।

৩. তৃতীয় ধাপে প্রয়োজনীয় উপাদান বা চলকগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উপযোগী একটি প্রশ্নমালা বা চেক লিষ্ট তৈরি করা। পরবর্তী পরিচ্ছেদে একটি ইউনিয়ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উপযোগী নমুনা প্রশ্নমালা বা চেক লিষ্ট সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৪. সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা নিজে বা তার কোন জরিপ কর্মীর মাধ্যমে প্রশ্নমালা বা চেকলিষ্ট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।

৫. এ স্তরে সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াজাত ও বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়।

একটি ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের একটি নমুনা চেকলিষ্ট নিম্নে দেখানো হলো:

১) প্রস্তাবিত ব্যবসায়ের পণ্যের নাম, ২) গ্রামের নাম, ৩) জনসংখ্যা, ৪) মাথাপিছু আয়, ৫) মাথাপিছু পণ্যের ভোগের পরিমাণ, ৬) সংশ্লিষ্ট এলাকায় পণ্যের কাঁচামাল উৎপাদনের পরিমাণ, ৭) সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, ৮) বিগত ৫ বছরে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির হার, ৯) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উপাদানের পরিমাণ, ১০) প্রতি কেজি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় (প্রতি একক), ১১) প্রতি কেজি পণ্যের বিক্রয় মূল্য (প্রতি একক), ১২) অন্য এলাকা থেকে পণ্যটির আমদানির পরিমাণ, ১৩) অত্র এলাকার বাইরে সম্ভাব্য রপ্তানির পরিমাণ, ১৪) প্রস্তাবকৃত পণ্যটির কাঁচামাল হিসেবে মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, ১৫) প্রস্তাবকৃত পণ্যটির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, ১৬) এসব শিল্প পণ্যের বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ, ১৭) গত পাঁচ বছরে চাহিদা বৃদ্ধির হার, ১৮) অন্যান্য তথ্য।

পরিবেশ বিশ্লেষণের কৌশল বা পরিবেশ মূল্যায়ন

(Techniques of Environmental Analysis or Assessment of Environment)

যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার সুষ্ঠু ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর, আর সুষ্ঠু ও কার্যকর সিদ্ধান্ত অনেকাংশে প্রভাবিত হয় পরিবেশ দ্বারা। ব্যবসায় পরিবেশ বলতে কোন ব্যবসায়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলোকে বুঝায়। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তি, আইন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা দ্বারা সে দেশের ব্যবসায় কার্যক্রম নানাভাবে প্রভাবিত হয়। ধরা যাক- কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি চাঙ্গা থাকে তবে ব্যবসায়ের কেনাবেচা ও আয় বৃদ্ধি পায়। তাই, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য পরিবেশগত বিভিন্ন উপাদানগুলো বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। যার কারণে ব্যবসায়িক পরিবেশ মূল্যায়ন করা একজন ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, তাই একটি ব্যবসায়ের কর্মকান্ডের উপর পরিবেশের মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। একজন ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায়ের উপর তিনধরণের পরিবেশের মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়। যথা: ১। যে স্থানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে সেখানকার জনগনের প্রভাব; ২। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় পরিবেশ; এবং ৩। সামগ্রিক অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক পরিবেশ মূল্যায়ন। আবার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও আওতা অনুসারে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিবেশও মূল্যায়ন করা দরকার হয়।

নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক পরিবেশের পারষ্পরিক সম্পর্ক দেখানো হলোঃ

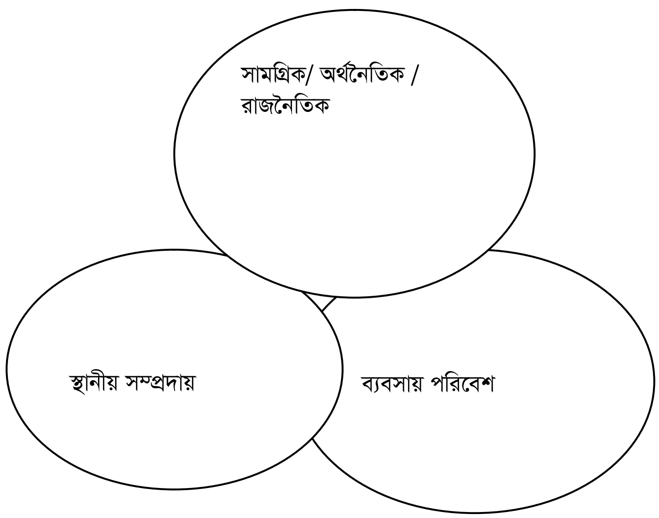

সূত্রঃ Entrepreneurship: Robert Ronstandt

স্থানীয় সম্প্রদায় মূল্যায়নঃ স্থানীয় জনসংখ্যার আকারের তুলনায় প্রস্তাবিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর ঐ এলাকায় অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আকার বিবেচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন শিল্প উদ্যোক্তার নিজস্ব অবস্থান কতটুকু গুরুত্ব পূর্ণ তা সর্বাগ্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

স্থানীয় পর্যায়ে নিজ ব্যবসায়ের তুলনামূলক গুরুত্ব পরিমাপ করার উপায় হচ্ছে নিজ ব্যবসায়ের বিক্রয়ের পরিমাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কর প্রদানের পরিমাণ নির্নয় করা। যদি একটি ব্যবসায়ের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়, তখন তার প্রভাব পণ্য সরবারহকারী, পুঁজির চাহিদা, প্রভৃতির উপর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার ব্যবসায়ের কলেবর হ্রাস পেলে পণ্য সরবরাহকারী ও পুঁজি সরবারহকারীদের উপর বিরুপ প্রভাব দেখা দেয়। যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ নতুন ব্যবসা স্থাপনকে স্বাগত ও বিভিন্নভাবে সমর্থন করে থাকে অথবা তার বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

এ ব্যতিত স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা, আয়ের হার, চাহিদা প্রভৃতি যাচাই করা প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি স্থানীয় নেতা, সমাজকর্মীরাসহ সকলের মনোভাব যাচাই করা প্রয়োজন হয়। সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ের ধরণ, কাঁচামাল সরবারহ, অর্থের সরবরাহ, দক্ষ, আধাদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, নেতা প্রভৃতি সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। একজন উদ্যোক্তা স্থানীয় পরিবেশ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত উত্তরগুলো জানতে হবেঃ

১. আপনি যেস্থানে ব্যবসা স্থাপন করতে চাচ্ছেন সেখানকার জনগণ সম্পর্কে আপনি কতটুকু পরিচিত?

২. আপনার প্রস্তাবিত ব্যবসায় স্থানীয় জনগণের কি ধরণের ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে?
৩. স্থানীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গের সমর্থন কতটুকু পাওয়া যাবে?
৪. স্থানীয় জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আপনার বিশেষ কোন দক্ষতা আছে কি?
৫. স্থানীয় সমর্থন পাবার লক্ষ্যে আপনার কিধরণের পরিকল্পনা রয়েছে?
৬. স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে কোন বাধা এলে আপনি তা কিভাবে মোকাবেলা করবেন?

পরিশেষে বলা যায়, একজন উদ্যোক্তা পরিবেশ মূল্যায়ন করে যদি ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ পান তাহলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারেন; তা নাহলে, উক্ত স্থানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সমীচিন হবে না।

ব্যবসায় পরিবেশ মূল্যায়ন

ব্যবসায়গত পরিবেশ মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একজন উদ্যোক্তা যে ব্যবসায় স্থাপন করতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে নিজ ব্যবসায়ের সাথে একটি তুলনা মূলক পর্যালোচনা করা।

ব্যবসায়গত পরিবেশ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তাকে প্রধানত: কতগুলো প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে। সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন, তা হলো ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সমজাতীয় হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের থেকে প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা কি হবে, ভবিষ্যৎ প্রস্তাবিত ব্যবসায়ের ব্যবস্থা কি হবে তা যাচাই করে মূল্যায়ন করে দেখা। সাধারণত: বাজার পরিমাপ ও বাজার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। কিন্তু জরিপ কাজ সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল বিধায় ছোট ব্যবসায়ের জন্য তা উপযুক্ত নয়। এ জন্য বিকল্প হিসেবে একটি প্রশ্নমালার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. প্রস্তাবিত শিল্প ও ব্যবসায় সময় পরিবর্তনের ফলে কি কি পরিবর্তন আসতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বানুমান করা।
২. ইতোমধ্যে এ শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির তুলনায় সেগুলোতে কি ধরণের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান?
৩. তীব্র প্রতিযোগীতামূলক বাজারে যদি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে কি ঘটতে পারে?
৪. এ শিল্পে ইনপুট সরবারহকারীর সংখ্যা কত ও তাদের বৈশিষ্ট্য কিরূপ?
৫. এ শিল্প পণ্যে বা সেবায় ক্রেতার সংখ্যা কত ও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি ধরণের?
৬. সরবরাহকারী মূল্য সংযোজন (value added) কতপরিমাণ নেয়?
৭. সংশ্লিষ্ট পণ্যের বর্তমান বাজারের আকার কি? ভবিষ্যতে তা বাড়ার সম্ভাবনা কতটুকু?
৮. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে ও শিল্পে কি প্রভাব পড়তে পারে?

উপরের প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য গুলো সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাতকরণের ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্পের উপর ব্যবসায়িক পরিবেশের প্রভাব যাচাই বা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

সামগ্রিক রাজনৈতিক/অর্থনৈতিক পরিবেশ মূল্যায়ন

যে কোন দেশের আইন মত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অর্থাৎ সামগ্রিক পরিবেশ সে দেশের নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ভিন্নতার করা কিধরণের প্রভাব ফেলে তা মূল্যায়ন প্রয়োজন। এসকল বিষয়ের প্রভাব যাচাই করতে কয়েকটি বিষয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। যেমন: আইনগত প্রভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

আইনগত পরিবেশ মূল্যায়ন

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিছু সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তবে এ আইনগুলো এমন হওয়া উচিৎ নয় যা উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ে নিরুৎসাহিত এবং বাঁধার সৃষ্টি করে। ব্যবসায়ের জন্য সুষ্ঠু আইন ও তার যথাযথ প্রয়োগ আবশ্যক। আইন শৃঙ্খলা অনুকূলে থাকা ব্যবসায়ের উন্নতি অগ্রগতির পূর্বশর্ত। তাই কোন দেশের কোন ব্যবসায়ের জন্য আইনগত পরিবেশ অনুকূল কি না তা যাচাই করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সম্পদ ভোগের অধিকার ও তা সংরক্ষণ করার জন্য যথাযথ আইন আবশ্যক। ঋণদান পদ্ধতি সহজ হওয়া আবশ্যক। একটি দেশের আইনগত পরিবেশ যাচাই করার জন্য নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর বের করা তা মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

১. ব্যবসায় স্থাপন,পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সব আইন রয়েছে তা কতটুকু সাহায়ক বা বাঁধার সৃষ্টি করে?

২. আইন জানমাল রক্ষায় যর্থাথ কি না?
৩. আইন ও তা প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু ও তা সহনীয় পর্যায়ে আছে কি না?
৪. ব্যবসায়ের জন্য আইন অনুকূল না প্রতিকূল?
৫. আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা আছে কি না?
৬. আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কতটুক আন্তরিক?
৭. আইনের শাসন কতটুক বিরাজমান?

উপরিউক্ত মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে ব্যবসায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক পরিবেশ মূল্যায়ন

একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেশ পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করে থাকে। গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক দল গঠিত ও পরিচালিত হয়। একটি দলের মতাদর্শ ও দর্শন ও নীতি পরষ্পরের মধ্যে বিরোধমূলক হতে পারে। তবে ক্ষমতাশীন দলের মতাদর্শ একটি দেশের ব্যবসায় কার্যক্রমকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে। যেমন- দেখা যায় কোন দল ক্ষমতায় থাকলে ব্যক্তিমালিকানা ব্যবসায় প্রসার ঘটে, আবার অন্য কোন দল ক্ষমতায় থাকলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাহলে দেখা যায় ক্ষমতার পালাবদলে ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রেণের ক্ষেত্রে সরকারের নীতির পরিবর্তন ঘটে। ফলে ব্যবসায় কার্যক্রম ব্যহত হয়ে থাকে। তাই ব্যবসা স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা প্রয়োজন:

১. দেশের বিভিন্ন মতাদর্শের দলগুলোর ক্ষমতার পরিবর্তনের পালা ঘন ঘন হয় কিনা?
২. ক্ষমতার পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব ব্যবসা ক্ষেত্রে কতটুকু পড়ে?
৩. ভবিষ্যতে যাদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের আদর্শ ব্যক্তিমালিকানা খাতের প্রতি কিরূপ প্রভাব ফেলবে?
৪. সরকারের শিল্পনীতি, রাজস্বনীতির কোন পরিবর্তন ব্যবসায়কে কতটুকু প্রভাবিত করে?
৫. ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপন করলে দেশের রাজনৈতিক দলের দৃষ্টি ভঙ্গি কি হবে?
৬. বিরোধী দলের রাজনৈতিক মনোভাব বর্তমান সরকারের প্রতি কেমন?
৭. রাজনৈতিক দলগুলোর দেশের প্রতি কমিটমেন্ট কতটুকু?

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব পর্যালচনাপূর্বক নতুন শিল্প স্থাপনে সিদ্ধান্ত নেযা যায়। যদি পরিবেশ অনুকূলে হয়, তবে ব্যবসায়ের উন্নতি ও অগ্রগতি হবে; নচেৎ মন্থরগতি হবে।

অর্থনৈতিক পরিবেশ মূল্যায়ন

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদান ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও প্রসারে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছে। প্রকৃত পক্ষে অনুকূল অর্থনেতিক পরিবেশ ব্যবসায়ের সাফল্যে অন্যতম পূর্বশর্ত। যেমন-মুক্ত অর্থনীতি ব্যবসায়ের সহায়ক; আবার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অর্থনীতির অন্যান্য উপাদান, যেমন- কাঁচামালের সহজলভ্যতা, সুলভ শ্রম, অনুকূল শিল্প নীতি, রজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি, বিশাল বাজার, ব্যবসায়ের উন্নয়নে সহায়ক। তাই একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে অনুকূল ও প্রতিকূল অর্থনৈতিক উপাদানগুলো ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। একজন সফল উদ্যোক্তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য নিম্ন বর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা দরকার:

১. দেশের অর্থনীতি মুক্ত, বা নিয়ন্ত্রিত বা মিশ্র কিনা?
২. সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়কের ভূমিকা পালন করছে কিনা?
৩. দেশের পূঁজিবাজার পূঁজি সংগ্রহের জন্য যথার্থ কিনা?
৪. ব্যবসা বা শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা আছে কিনা?
৫. কাঁচামালের প্রাপ্যতা কতটুক?
৬. সরকারে রাজস্ব নীতি শিল্পোন্নয়নে সহায়ক কিনা?
৭. সরকারে শিল্পনীতি শিল্পন্নোয়নে সহায়ক কিনা?
৮. দেশের কর কাঠামো ব্যবসায়ের অনুকূল কিনা?
৯. দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা উন্নত কিনা?

কারিগরি পরিবেশ মূল্যায়ন

এছাড়াও প্রযুক্তিগত দিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে; ফলে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ব্যবসায় খাতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দেশের প্রযুক্তিগত পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য নিম্ন লিখিত প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন:

১. যে শিল্প স্থাপন করা হবে, সেসকল যন্ত্রপাতি দেশে পর্যাপ্ত আছে কিনা?
২. দেশে প্রযুক্তি উন্নয়নে কতটুক অগ্রসর?
৩. প্রযুক্তি সহায়তায় সরকারী মনোভাব অনুকূলে কিনা?
৪. দেশে যন্ত্রাংশের প্রাপ্যতা আছে কি না?
৫. কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রাচুর্যতা আছে কি না?
৬. কারিগরি প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা আছে কি না?

এসকল প্রশ্নের উত্তরের উপর কারিগরি পরিবেশ নির্ভর করে যা হতে পারে অনুকূল বা প্রতিকূল যা শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করে।

পাঠসংক্ষেপ

পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন এবং যে কোন ধরণের প্রকাশিত তথ্যই পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে, প্রাথমিক তথ্যের উৎসগুলোর মধ্যে ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠী, ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক সম্প্রদায়, সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ, সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বাজার গবেষণা ও অর্থনৈতিক জরিপ করা যায়; আর এর হাতিয়ার হিসেবে প্রশ্নমালা বা চেকলিষ্টের মাধ্যমে সাক্ষ্যাতকার গ্রহণ করা হয়। আবার ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তি, আইন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা দ্বারা সে দেশের ব্যবসায় কার্যক্রম নানাভাবে প্রভাবিত হয়। একজন ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায়ের উপর তিনধরণের পরিবেশের মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়। যথা: ১। যে স্থানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে সেখানকার জনগনের প্রভাব; ২। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় পরিবেশ; এবং ৩। সামগ্রিক অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক পরিবেশ মূল্যায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিবেশ বিশ্লেষণের কৌশল কি ?
২. রাজনৈতিক পরিবেশ মূল্যায়ন কি ভাবে করা যায় ?
৩. কারিগরি পরিবেশ মূল্যায়ন বলতে কি বোঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবসায়িক পরিবেশ মূল্যায়ন বলতে কি বোঝেন। ব্যবসায়ীক পরিবেশ মূল্যায়ানের কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।